একক ৬ □ বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

৬.১ প্রস্তাবনা ঃ তপস্বী ও তরঙ্গিনী ঃ প্রাক্-কথন

৬.২ উৎস ও অনুষঙ্গ ঃ সারাংশ ও আলোচনা

৬.৩ পুরাণের পুনর্জন্ম

৬.৪ তপস্বী ও তরঙ্গিনী ঃ আঙ্গিক-বিচার

৬.৫ কাব্যনাট্য হিসেবে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'

৬.৬ চরিত্রায়ণ

৬.৭ অন্যান্য চরিত্র

৬.৮ অনুশীলনী

৬.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

আমি কবি, এ সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর—
আমি যে রচিব কাব্য, এ উদ্দেশ্য ছিল না স্রষ্টার।
তবু কাব্য রচিলাম। এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।

উদ্দীপ্ত তারুণ্যের উদ্ধত এ দাম্ভিক উচ্চারণে একদিন সূচিত হয়েছিল আধুনিক বাংলা কবিতার নবজন্মের ব্রাহ্মমুহূর্ত। 'বন্দীর বন্দনা'য়, আধুনিক কবিতার আন্দোলনের পুরোহিত বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং। কবিতা-গল্প-উপন্যাস-কাব্যনাটক-প্রবন্ধ-সমালোচনা, সাহিত্যের প্রায় সব ক'টি শাখা পল্লবিত ও পুষ্পিত হয়েছিল তাঁর সুঅধীত সংবেদী মননের জলসেকে। পত্রিকা-সম্পাদনাও বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত। বাংলা সাহিত্যধারায় বুদ্ধদেব বসু তাই স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট এক অধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৯০৮ (১৫ অগ্রহায়ন ১৩১৫), কুমিল্লায়। পিতা ভূদেবচন্দ্র বসু, মাতা বিনয়কুমারী। 'আমার ছেলেবেলা'য় বুদ্ধদেব জানিয়েছেন—'আমি বিনয়কুমারীর প্রথম ও শেষ সন্তান—আমার জন্মের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রসবোত্তর ধনুষ্টঙ্কার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। ... ভূদেবচন্দ্র পত্নীকে হারিয়ে বছর খানেকের জন্য পরিব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। এই দুই কারণে আমি আমার মাতামহ-মাতামহীর ঘরেই

মানুষ হয়েছিলাম—কার্যত তাঁরাই ছিলেন আমার পিতামাতা। ... তথ্যের দিক থেকে হয়তো বলা দরকার যে আমার মাতৃকুল পিতৃকুল দুয়েরই আদিনিবাস ছিল বিক্রমপুরে—গ্রামের নাম যথাক্রমে বহর ও মালখানগর। পরবর্তীকালে যে কন্যাকে বিবাহ করলাম তাঁর পিতৃভূমিও বিক্রমপুরেরই অন্তর্ভুক্ত।"

১৯২৩ সালে প্রাক্-ম্যাট্রিক শেষ দুটি ক্লাস পড়বার জন্য ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ঢাকার 'তোষিণী' পত্রিকায় প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়। ১৯২৪-এর অক্টোবরে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্ম্মবাণী' প্রকাশিত হয়। ১৯২৫-এ ম্যাটিক পরীক্ষার প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন ও ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৬-এ 'কল্লোল' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) পত্রিকায় 'রজনী হল উতলা' গল্প প্রকাশিত হলে আধুনিক সাহিত্যের প্রতিপক্ষ 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন বুদ্ধদেব বসু। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এই সময়েই প্রকাশিত হয় 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থ, 'সাড়া' উপন্যাস। ১৯৩১-এ ইংরেজিতে এম.এ-পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এবছরই ঢাকা ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন রাণু (প্রতিভা) সোমের সঙ্গে। ঐ সময়েই রিপন কলেজে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯৩৫-এ ১ অক্টোবর ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের যুগ্ম সম্পাদনায়। সহকারী সম্পাদক ছিলেন সমর সেন। তারপর একে একে প্রকাশিত হয়েছে কঙ্কাবতী, নতু পাতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদীর শাড়ি, শীতের প্রার্থনা, বসন্তের উত্তর প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ; নির্জন স্বাক্ষর, মৌলিনাথ, রাত ভ'রে বৃষ্টি-র মতো উপন্যাস। অনুবাদ করেছেন কালিদাস এবং শার্ল বোদলেয়ার; প্রকাশিত হয়েছে 'সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য' কিংবা 'An Acre of Green Grass' প্রভৃতির মতো সমালোচনা গ্রন্থ। ইতিমধ্যে পেনসিলভেনিয়ায় একবছর অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে প্রধান অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন; আমন্ত্রণ পেয়েছেন স্বদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৭ সালে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কাব্যনাটকের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। বস্তুত, কালসন্ধ্যা, অনাম্নী-অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ কাব্যনাটকগুলি বুদ্ধদেবের কবিপ্রতিভাকে অন্য এক মাত্রায় ধারণ করে আছে। ১৯৭০-এ ভারত সরকার কর্তৃক তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ কলকাতার স্বগৃহে কবির মৃত্যু হয়। 'স্বাগত বিদায়' কাব্যগ্রন্থের জন্য মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করা হয় তাঁকে।

৬.১ প্রস্তাবনা ঃ তপস্বী ও তরঙ্গিনী ঃ প্রাক্‌কথন

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র বিষয়বস্তু অনেকদিন ধরেই যে বুদ্ধদেবের কল্পনালোকে লালিত হয়েছে তার প্রমাণ 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' গ্রন্থে এই নাটক রচনার পশ্চাৎপট নিয়ে তাঁর অভিমতে। সেখানে তিনি লিখেছেন—

"একবার একটা নাটক ভেবেছিলাম সাবিত্রীকে নিয়ে—বহুকাল ধরে লালন করেছিলাম মনে-মনে। অবশেষে সেটা পর্যবসিত হল একটা দীর্ঘ কবিতায়, রোম আর কীট্‌স-এর মৃত্যু দিয়ে যার আরম্ভ এবং যার শিরোনামায়

সাবিত্রীর নাম উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু আরো ভালো উদাহরণ হয়তো 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-এ নাটকটাকেও কাব্য জাতীয় রচনা বলে ধরে নিচ্ছি—সেটা আমি লিখেছিলাম আটান্ন বছর বয়সে, কিন্তু প্রথম যখন ভেবেছিলাম তখন আমি সবে মাত্র উত্তর তিরিশ। সেই আমি প্রথম নিচ্ছি কালীপ্রসন্নর মহাভারতের আস্বাদ; সব বিস্তার ও অনুপুঙ্খ সমেত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান পড়ে চমকে উঠেছি—এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র বাইরে কিছু জানতাম না। দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎপট, গাঁয়ের মেয়েরা, অজ্ঞান কিশোর তপস্বী ও বিদগ্ধ চতুর বারাঙ্গনার প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের আশ্চর্য মুহূর্ত—এ সবই আমার কল্পনায় ধৃত হয়েছিল তখন, রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিল এলিয়েটের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল' নাটকটা। মনে পড়ে লিখেও ফেলেছিলাম গাঁয়ের মেয়েদের মুখের প্রথম দুটো লাইন—সে-দুটো দিয়েই তপস্বী ও তরঙ্গিনীর আরম্ভ, যদিও সাতমাত্রা ছন্দ ও প্রথম দুটো শব্দ ছাড়া আদি লেখনের আর কিছুই সেখানে রক্ষিত হয়নি। এক্ষেত্রে আমি বোধ হয় জানি, আগে লিখে উঠতে পারিনি কেন, কেন আমাকে বা রচনাটিকে—এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনার সময় আমি ঋষ্যশৃঙ্গ বিষয়ে যথেষ্ট জানতাম না, বিষয়টির মর্মস্থলে প্রবেশ করিনি তখনও, সেটিকে একটি স্বকীয় রচনায় জীবন্ত করে তোলার মতো তহবিল আমার ছিল না। সেগুলি সংগৃহীত হল নানা দেশে ঘুরে বেড়াবার ও ক্লাসে পড়াবার সময়, পড়াবার জন্য অনেক বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিশ্ব পুরাণে আমার বিবর্ধমান কৌতূহলবশত। যাকে গবেষণা বলে সেটা পণ্ডিতমহলের মনোপলি নয়, মাঝে মাঝে কাব্য রচনাতেও তার প্রয়োজন ঘটে, এই কথাটি বোঝার জন্য আমাকে অনেকগুলো বন্ধুর বছর বাঁচতে হয়েছিল।"

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'দেশ' পত্রিকার এপ্রিল ১৯৬৬-র পাঁচটি সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 'ঈষৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন' করার পর গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ আগস্ট, তথা শ্রাবণ ১৩৭০-এ, আনন্দ পাবলিশার্স থেকে।

লেখকের মন্তব্যটি এখানে স্মরণীয়—

"এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত, এবং রচনাটিও শিল্পিত—অর্থাৎ, একটি পুরাণ কাহিনিকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না; কোথাও-কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন; এটা যদি গ্রাহ্য হয়, তাহলে 'ত্রেতা' যুগের চরিত্রের মুখে 'দ্বাপর' যুগের উল্লেখ থাকলেও কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।"

এই সূত্র ধরেই আমরা পৌঁছে যেতে পারি 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-র উৎস-সন্ধানে।

৬.২ উৎস ও অনুষঙ্গ ঃ সারাংশ ও আলোচনা

পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও বৌদ্ধজাতকে নিহিত 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-র উৎস। রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতাও এই কথাবস্তুর আধার। এছাড়াও জেসি ওয়েস্টনের From Ritual to Romance গ্রন্থটিতে বিধৃত

বিভিন্ন আদিকল্প কাহিনিও বুদ্ধদেব বসুকে সম্ভবত প্রাণিত করেছিল। বইটি যে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল চিঠিপত্রে তার প্রমাণ আছে।

পুরাণ-বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি রাজা দশরথকে শুনিয়েছিলেন তার মন্ত্রী ও সারথি সুমন্ত্র, রামায়ণে তার উল্লেখ আছে। সেখানে কাহিনিটি এইরকম—

অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন লোমপাদ। সে রাজ্যে অনাবৃষ্টিজনিত বিপর্যয় দেখা দিলে তাঁর মন্ত্রীরা লোমপাদকে পরামর্শ দিলেন, মায়াবলে ঋষ্যশৃঙ্গাকে রাজ্যে নিয়ে আসতে পারলে তবেই এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। কেননা, তাঁরা জেনেছিলেন আজন্ম কুমার ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য ভঙ্গ করে তাঁকে নগরে আনতে পারলেই রাজ্যে বৃষ্টি নামবে। তাই ছলাকলায় পটীয়সী বারাঙ্গানাদের ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যহরণের কাজে নিযুক্ত করলেন তাঁরা। বারাঙ্গনার দল নানাভাবে ঋষ্যশৃঙ্গাকে মুগ্ধ করে তাঁর কৌমার্য হরণ করলো। সঙ্গম-পরিতৃপ্ত ঋষ্যশৃঙ্গা অঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করলেন। তখন নামল বৃষ্টি। আর রাজকন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ হল ঋষ্যশৃঙ্গের।

মহাভারতের বনপর্বের ১১১ সংখ্যক অধ্যায়ে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি রয়েছে। লোমশমুনি বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই উপাখ্যানটি বিবৃত করেন। সংক্ষেপে সে কাহিনি এইরকম—

ঋষি বিভাণ্ডকের পুত্র কুমার ঋষ্যশৃঙ্গ। মৃগীর গর্ভে মাথায় একটি শৃঙ্গসহ তাঁর জন্ম। অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিথ্যাচার এবং পুরোহিতদের প্রতি অত্যাচার করলে ইন্দ্রদেব রুষ্ট হয়ে তাঁর রাজ্যে বর্ষণ বন্ধ করে দিলেন। ফলে রাজ্যে দেখা দিল খরা, দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার। তখন কোনো তপস্বী রাজাকে উপদেশ দিলেন—সরলস্বভাব এবং নারী-পরিচয় বর্জিত আজন্ম বনবাসী ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য ভঙ্গ করে তাঁকে নগরে আনতে পারলেই অঙ্গাদেশে বৃষ্টি নামবে, ফসল ফলবে। তাই ছলনার দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য হরণ করে অঙ্গারাজ্যে তাঁকে নিয়ে আসার জন্য নিয়োগ করা হল চতুরা বারাঙ্গানাদের। কিন্তু, তারা ভয় পেল ঋষ্যশৃঙ্গের তপোবলকে, ধ্বংস হবার ভয়ে শেষ পর্যন্ত সম্মত হল না এই দুরুহ কার্যে। অবশেষে এক প্রবীণা বারাঙ্গানা প্রচুর উপঢৌকনের শর্তে এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়। সেই প্রবীণার পরামর্শে রূপযৌবনবতী একদল বারাঙ্গানা বিলাস-বিভ্রমে মুগ্ধ, সম্মোহিত করে ঋষ্যশৃঙ্গাকে নগরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ঋষ্যশৃঙ্গের নগরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বৃষ্টি, রাজা লোমপাদ কন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ দেন ঋষ্যশৃঙ্গের। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের-জনক বিভাণ্ডক প্রথমে তাঁর পুত্রকে স্বধর্ম ভ্রষ্ট করবার জন্য রাজা লোমপাদকে অভিযুক্ত করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে পুত্রের রাজৈশ্বর্য-বৈভব দেখে খুশি হয়ে তাঁকে রাজপুরীতে বসবাসের অনুমতি দেন। ঋষ্যশৃঙ্গা ও শান্তার সন্তান জন্মাবার পর দুজনেই রাজধানী ত্যাগ করে অরণ্য-আশ্রমে ফিরে যান।

বৌদ্ধজাতকের অন্তর্গত 'অলম্বুষা জাতক' ও 'নলিনিকা জাতক'-এ ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনির উল্লেখ পাই আমরা। অলম্বুষা জাতকে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম, তাঁর তপস্যার তেজে ইন্দ্রের আতঙ্ক এবং তপস্যা ভঙ্গের জন্য অলম্বুষা নামে এক অপ্সরাকে প্রেরণ এবং অপ্সরার আলিঙ্গনে ঋষ্যশৃঙ্গের ব্রহ্মচর্য নাশ, কিছুদিন তপোভ্রষ্টভাবে ঋষ্যশৃঙ্গের জীবনযাপন, শেষে আত্মসংযমের মাধ্যমে কামানুরাগ পরিহারপূর্বক তপোবল পুনর্লাভের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

আর 'নলিনিকা জাতকে'-ও ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যায় ইন্দ্রের আতঙ্ক ও তপস্যাভঙ্গের জন্য রমণী প্রেরণের কথা আছে। তবে প্রথম জাতকের কাহিনির মতো সে-রকণী কোনো অপ্সরা নয়। সে-নারী রাজকুমারী নলিনিকা। নির্দেশমতো এই রাজকন্যা নলিনিকা 'নরনারী সম্পর্কে ভেদ জ্ঞান দান' করে, ঋষ্যশৃঙ্গাকে বিলাস-বিভ্রমে বিমুগ্ধ করে 'শীলভ্রষ্ট' করা মাত্রই ইন্দ্রদেব বারাণসী রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটালেন।

Jessie Weston তাঁর From Ritual to Romance গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে মহাভারতের এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় The Freeing of Water অংশে 'গ্রেল লিজেন্ড' এর আদিপর্বের আখ্যানরূপে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনিকে দেখেছেন। সি ওয়েস্টন অবশ্য এই আখ্যান ভাগ গ্রহণ করেছেন ভন শ্রোয়েডার-এর মহাভারতীয় কাহিনির উল্লেখ থেকে সরাসরি মহাভারত থেকে নয়। The Freeing of Water-এর কথাবস্তুর সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকের কাহিনি-পরিকল্পনার যেন কোথাও নৈকট্য রয়েছে। রাজ্যে অনাবৃষ্টি, নারী সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ব্রহ্মচারীকে নারীর লাস্যে বিভ্রান্ত করে নগরীতে নিয়ে আসার কল্পনা আপাতভাবে মহাভারতের অনুসারী। কিন্তু মিস ওয়েস্টনের কাহিনিতে আছে এক বৃদ্ধা গণিকা কার্যসিদ্ধি ঘটালেন। তবে কিছু সুন্দরী নারীর সাহায্যে নয়, তাঁরাই সুন্দরী ও স্বৈরিণী কন্যার সাহায্যে। ওয়েস্টন লিখেছেন—An old woman, who has a fair daughter of irregular life, undertake the seduction of the hero এবং আরো জানিয়েছেন, ভন শ্রোয়েভারের উল্লিখিত কাহিনিতে রাজকন্যা স্বয়ং প্রলোভনকারিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। From Ritual to Romance গ্রন্থটি কবির ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল এবং এই কাহিনির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন এবং তরঙ্গিনীর দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য হরণের ব্যাপারে এই উল্লেখের দ্বারা তিনি চালিত হয়েছেন। আর তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতা, এই কবিতা-পাঠেই তিনি প্রথম ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনির সঙ্গে পরিচিত হন। বস্তুত ঋষ্যশৃঙ্গের এই উপাখ্যানের মধ্যে কবিতা ও নাটকের যুগপৎ সম্ভাবনাকে প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের। মূল রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গাকে অঙ্গরাজ্যে আনার জন্য কোনো বিশেষ বারাঙ্গনার কথা বলা হয়নি। একদল বারাঙ্গানার কথা বলা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই একদল বারাঙ্গানার মধ্যে থেকে একজনকে কল্পনা করেছেন কাব্যবিষয়রূপে—মূল রামায়ণে বারাঙ্গানাদের কারো নাম পরিচয় নেই, তারা শুধু সমষ্টি, ব্যবহারেও তারা সামষ্টিক। 'অনুমেয় রূপান্তরের সম্ভাব্যতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে বিদ্ধ করেছেন শুধু একজন। 'পতিতা' নাটকীয় একোক্তি-র (Dramatic Monologue) স্বভাবমিশ্র কবিতা, এখানে তার আত্মপরিচয়ে নামের প্রয়োজনে হয়নি। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হয়েছে—

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে
পাঠাইলে বনে যে কয়জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে,
আমি তারি এক বারাঙ্গনা।

বুদ্ধদেব বসু এই বারাঙ্গানাকে তরঙ্গিনী নাম পরিচয়ে চিহ্নিত করেছেন, তাকে বিশেষ পটভূমিতে স্থাপন করেছেন। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস কেউই কোনো একক বারাঙ্গানার মানসিক ভাবন্তরের ('বিপরীত দিকে পরিবর্তন) উল্লেখমাত্র করেননি। তা প্রথম উদ্ভাসিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়। ঋষ্যশৃঙ্গাকে ছলনা করতেই এসেছিল সে রূপাজীবী, কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের পবিত্র সুন্দর দৃষ্টিতে তার নবজন্ম ঘটল।

তাপস কুমার চাহিলা আমার
মুখপানে করি বদল নত।
প্রথম-রমণী-দরশ-মুগ্ধ
সে দুটি সরল নয়ন হেরি
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বজ্র ভেরী।
কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে—
কোন দেব আজি আনিলে দিবা!
তোমার পরশ অমৃত সরস,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।'

এই অ-পূর্ব অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়েই সে রাজমন্ত্রির কাছে ফিরিয়ে দিতে এসেছে সব উপঢৌকন অলংকার। এই 'পতিতা' নামহীনা নায়িকা, কার্যসিদ্ধির জন্য প্রাপ্ত উপহার সে অক্লেশে ফিরিয়ে দিতে চায়, কেননা পরিবর্তে সে পেয়েছে অমৃতময় এক স্পর্শ। তুচ্ছ উপহারের থেকেও অনেক বড় অনেক গভীর কিছু অর্জন করেছে সে। রাজপুরুষের উপহাসের প্রত্যুত্তরে সে ব্যক্ত করেছে তার অভিজ্ঞতা।

মধুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি—
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,
শুনিনি এমন সত্য বাণী।
আমিও দেবতা, ঋষির আঁখিতে
এনেছি বহিয়া নূতন দিবা
অমৃতসরস আমার পরশ
আমার নয়নে দিব্য বিভা।
কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে
'আনন্দময়ী মুরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।'

এই পরশপাথর বদলে দিল সেই 'পতিতা'-কে, প্রমোদ শিখর থেকে চিরজন্মের মতো নির্বাসন ঘটল তার, দেবত্বে উত্তীর্ণ হল সে,—তার নারীসত্তা। সুন্দরের সংস্পর্শে তার জন্মান্তর ঘটে গেল, কাম রূপান্তরিত হল প্রেমে, ঋষ্যশৃঙ্গই এককভাবে উদ্ধার করলেন এই 'পতিতা'কে। রবীন্দ্র-রচনায় এইভাবে দেহজ কামনা বিশুদ্ধ অ-লৌকিক সৌন্দর্যস্তরে সমুত্তীর্ণ হয়েছে এবং এই বিষয়টি প্রবুদ্ধ করেছিল বুদ্ধদেব বসুকে। 'আনন্দ তোমার নয়নে

আনন্দ তোমার চরণে'—বারবার স্মরণ করছে তরঙ্গিনী তার উদ্দেশে উচ্চারিত ঋষ্যশৃঙ্গের এই উক্তি। বুদ্ধদেব তাঁর কাব্যনাটকে রবীন্দ্র-কল্পনাকে মান্য করেছেন এবং তারপরেও তিনি নিজস্বতা বজায় রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু তরঙ্গিনীর জন্মান্তর-অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, আর বুদ্ধদেব উভয়েরই অর্থাৎ তপস্বী ও তরঙ্গিনী উভয়েরই নবজন্মের কথা বলেছেন। কাম থেকে প্রেমে উত্তরণ ঘটল দুজনেরই, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং তরঙ্গিনী, আত্মদর্শনের পথে নিষ্ক্রমণ ঘটল দুজনেরই।

রামায়ণ, মহাভারত কিংবা বৌদ্ধ জাতকে আমরা একই কাহিনির অল্পবিস্তর পার্থক্য দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনিকে একভাবে রূপান্তরিত করেছেন। আর বুদ্ধদেব বসু এই সমস্ত উৎসকে অঙ্গীকার করেও তাকে নিজস্বতায় পুনর্নির্মাণ করেছেন। বুদ্ধদেবের লেখনীতেই ঘটেছে পুরাণের পুনর্জন্ম।

৬.৩ পুরাণের পুনর্জন্ম

লিখিত পুরাণ কাহিনি বা তারও পূর্বযুগের পুরাণের বীজস্বরূপ লোকশ্রুতিনির্ভর গল্প কাহিনিগুলিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মিথ্ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই আখ্যানগুলি 'আদিম পুরাণ-কথা'। কিংবদন্তীমূলক ইতিবৃত্ত ও কল্পনামিশ্রিত কাহিনির সঙ্গে ঐ মিথগুলির কিছুটা পার্থক্য আছে। এই কাহিনিগুলিতে অলৌকিকতার মধ্যেও বিদ্যমান আবহমানকালের মানবজীবনের সত্যরূপ। তবে সাংকেতিকভাবে বিন্যস্ত এই অলৌকিকতার মর্মোদ্ধার করতে পারলেই ঐ শাশ্বত জীবনসত্যের রূপ বোঝা সম্ভব হয়। কখনো কবি তথা শিল্পী লিখিত ঐ পুরাণ-কাহিনিকে নবযুগের পটে পুনর্লিখিতভাবে প্রকাশ করেন। শিল্পসৌন্দর্য ও চিরন্তন মানবরসের সম্মিলনে তখন যথার্থই পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটে। পুরাণরসের সঙ্গে যুগচৈতন্য ও শিল্পীর আত্মচেতনার রঙ মেলে সেই রচনায়। কিন্তু কোনো কোনো রচনায় শিল্পী পুরাণ-কাহিনির অন্তরালে আদিম-পুরাণের সত্য বা মিথ-কাহিনির আবিষ্কার করতে চান। নিজের রচনাকে সেই পুরাতন সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে চান। রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটিকে এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি। মিথ-পুরাণের ব্যবহার এখানে আখ্যানধর্মী হয় না, প্রতীকধর্মী হয়ে ওঠে।

বস্তুত, শিল্পী জগৎ ও জীবনকে যেভাবে দেখতে চান—বাস্তব জীবনে তিনি সর্বদা সেই কল্পনার লীলার প্রতিরূপ দেখতে পান না। তাই বাস্তবকে মিথের কল্পজগতে সঞ্চারিত করে দেখতে চান বা ভাষান্তরে তিনি তাঁর কল্পনাগুলিকে মিথ-পুরাণের বাস্তবসত্যের পটে প্রতিফলিত করেন কিংবা 'কল্পনাগুলিকে এক নূতন বাস্তবতায় রূপায়িত করেন'। তার ফলে পুরাণের পুনর্জন্মের পাশাপাশি মহাকাল বা বিশ্বনিয়তির একটি ব্যাপ্ত প্রেক্ষাপটও রচিত হয় আর শিল্পীর সৃজনলীলা নিছক ব্যক্তিক সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন জীবনস্বপ্ন হয়ে ওঠে।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'দময়ন্তী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা', 'যে আঁধার আলোর অধিক' 'মরচে-পড়া পেরেকের গান' কাব্যের অনেকগুলি কবিতাতেই পুরাণের প্রচ্ছদের অন্তরালে মিথের সত্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং সেই নূতনতর বাস্তবতার নির্মাণে অলৌকিকতার বিভায় নিজের শিল্পী সত্তাকেই নানারূপে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাছাড়া যুদ্ধোত্তর কালের অনেক বিশিষ্ট কবি-শিল্পীর মধ্যেই যে জীবনসমস্যাটি রয়েছে বুদ্ধদেব

বসুর মধ্যেও তা প্রবলভাবে বিদ্যমান। তা হল এক তীব্র একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতাবোধ। এই বিরূপ বিশ্বে ও জড়বাদী সভ্যতায় সংবেদপ্রবণ অনুভূতিশীল চৈতন্যবান কবি-শিল্পী তাঁর নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা সন্ধান করতে চেয়ে শুধু কাতরই হন। দ্বন্দ্ব বাধে কেবল জড়প্রকৃতির সঙ্গে নয়, জৈব প্রকৃতির সঙ্গেও। 'বন্দীর বন্দনা'র 'মানুষ' কবিতায় যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল তা' প্রলম্বিত হয়েছে 'মরচে-পড়া পেরেকের গান' কবিতায় 'প্রাণ ও মন—এক অন্তহীন বিতর্কের অংশ' কবিতা পর্যন্ত। অথচ মনে হয়, কবিতা ও কাব্যনাটকে। সমস্ত জীবন ধরে যে চিন্তাগুলি, অর্থাৎ দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব, শিল্পীজীবনের সমস্যা, দাম্পত্য ও বিবাহোত্তর প্রেম, মানবজীবনে ও সভ্যতায় বৈনাশিক প্রহরের প্রভাব প্রভৃতিকে তাঁর কবিতা ও কথাসাহিত্যে রূপ দিয়েছেন, তাঁর মিথ-পুরাণবিত্তিক কাব্যনাটকগুলিতেই সেই ভাবগুলি যেন সাগরসঙ্গমের চরিতার্থতা লাভ করল। অমলেন্দু বসুর কথায় ... বুদ্ধদেব বসুর সম্পূর্ণ সৃজনীকর্মে প্রথম থেকে প্রবাহিতা একটি অনতিপ্রশস্ত তরঙ্গিনী যেন—ক্রমেই প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর মহানদীতে পরিণত হয়েছে।' অতীতের পথপরিক্রমার সমান্তরালভাবে বর্তমানের জীবন-অন্বেষাকে মিলিয়ে দিতে বুদ্ধদেব যে আগাগোড়া আগ্রহী, মহাভারতের কথার অভিনব বিশ্লেষণে তার স্বাক্ষর আছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে একবার বলেছিলেন, ব্যক্তি অভিজ্ঞতা শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যতক্ষণ না মিলতে পারছে ততক্ষণ তা সাহিত্যে মূল্যহীন। আর এজন্য একমাত্র সহায়ক হচ্ছে মিথের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের সঙ্গে, ব্যক্তি অভিজ্ঞতার সমন্বয়। প্রাচীনকালেও প্রায় একই উদ্দেশ্যে মিথের ব্যবহার ছিল বলে মনে করেন বিষ্ণু দে। তাঁর মতে 'সাহিত্যে ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন ও সমাজসত্তার অসঙ্গতি এড়াবার জন্যে সেকালের সাহিত্যে পৌরাণিক গল্পের মাহাত্ম্য থাকতো।' একালের সাহিত্যে শুধুমাত্র সমাজসত্তার সঙ্গে অসঙ্গতি এড়াবার জন্যেই মিথের ব্যবহার হয় না, পুরাণের রূপক-চেতনার দ্বারাই বর্তমান জটিল বিশ্বের দ্বার উন্মোচন করতে চান একালের কবি। সাম্প্রতিক জীবনাভিজ্ঞতা যখন একটি বিশ্বের অভিজ্ঞানের জন্ম দেয়, তখনই কবি ফিরতে চান মিথের কাছে। কারণ, মিথ মানবপ্রজাতির সত্তার অভিজ্ঞানের আধার। আধুনিক 'ফাঁপা' মানুষের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সত্তা ও খণ্ডিত জীবনবোধে মিথ চেতনাই সঞ্চারিত করতে পারে শাশ্বত 'মানবমূল্যবোধ'।

মধুসূদনের কাব্যে কিংবা আরো পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা পুরাণ ব্যবহার দেখেছি। কিন্তু ত্রিশের পরবর্তী কবিদের মধ্যে মিথ ব্যবহারের প্রাণনা যুগিয়েছিল পাশ্চাত্যের এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, জেমস্ জয়েস, টমাস মান, কাফকা প্রমুখ কবি-শিল্পী। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব তাঁদের রচনায় দেশি ও বিদেশি মিথের সার্থক ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তবে বুদ্ধদেব বসু ভারতীয় পুরাণেই সমধিক উৎসুক, যদিও গ্রীকপুরাণের ইলেক্ট্রা কাহিনি তাঁর 'কলকাতার ইলেকট্রা'য় ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর এই মিথ-আশ্রমের কারণ খুঁজতে গিয়ে মাহবুব সাদিক বলেছেন—'বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বস্তুবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে একক ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সত্তা। অভিযোজন সামর্থ্যের অভাবের কারণে তিনি জনবিচ্ছিন্ন। তাঁর অন্তর্মানসের বিশিষ্টতার জন্যেও তিনি বিচ্ছিন্ন। জনবিচ্ছিন্ন এই একক ব্যক্তিসত্তা বহির্জাগতিক দ্বন্দ্বময় গতিশীল পৃথিবীতে কোন শক্ত বহিরাশ্রয়ের সন্ধান না পেয়েই মিথাশ্রয়ী হয়েছে।'

বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং বলেছেন, 'পুরাণ কথার ধর্মই এই যে, তা একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী

পেরিয়ে, ভৌগলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।' সেই সূত্রেই নানাভাবে তাঁর রচনায় মিথের নিপুণ বিন্যাস। আমাদের আলোচ্য 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-ও তার ব্যতিক্রম নয়। বুদ্ধদেবের কবিসত্তার প্রথমাবধি অনুসন্ধান কাম ও প্রেমের সম্পর্ক। কামনাময় যৌবনের যজ্ঞবেদীর অনলসম্ভূত যে প্রেম, তা-ই কবির, অদ্বিষ্ট। কাম থেকে নিরন্তর উত্তরণ-সতৃষ্ণ এক সত্তা, পৃথিবীর রূপমহলে শাশ্বত সৌন্দর্য ও প্রেমের স্বর্গপুরী নির্মাণে সর্বদা প্রয়াসী, সেই ভাবনাই মিলতে চাইল পুরাণের ঋষ্যশৃঙ্গ আখ্যানের মধ্যে। আলোচ্য নাটকের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছেন—"... এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত; এবং রচনাটিও শিল্পিত—অর্থাৎ একটি পুরাণ কাহিনিকে আমি নিজের মনোমত করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলাবাহুল্য, এ ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না; কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন।" আর কাম থেকে প্রেমে উত্তরণের ইতিহাস এই কাহিনিতে যেভাবে রয়েছে, তাই বুদ্ধদেবকে আকৃষ্ট করেছিল। নাটকটি 'প্রযোজনার জন্য পরামর্শ' অংশে তিনি লিখেছেন—"লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে, তারই প্রভাবে দু'জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হল—নাটকটির মূল বিষয় হল এই। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক-নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিনীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয় লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হল 'পতন', আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোমান্টিক প্রেম'—যেভাবে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'য় বর্ণিত আছে, সেইভাবেই। 'রোমান্টিক প্রেম'—যেভাবে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'য় বর্ণিত আছে, সেইভাবেই। 'রোমান্টিক প্রেম' অর্থ হল কোনো বিশেষ একজন ব্যক্তির প্রতি ধ্রুব, অবিচল অবস্থা নির্বিশেষ, এবং প্রায় উন্মাদ হার্দ্য আসক্তি—যার প্রতীক পাশ্চাত্য সাহিত্যে ট্রিস্টান এবং আমাদের সাহিত্যে রাধা।"

ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিনীর মধ্যে দিয়ে প্রথম পেয়েছিলেন এযাবৎ অনাস্বাদিত এক অভিজ্ঞতা, জেনেছিল 'নারী'কে। বর্ষণহীন দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে আসবেন ঋষ্যশৃঙ্গ, কৌমার্যভঙ্গের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আসবেন। নারী-পুরুষের শরীরী মিলনের অনুষঙ্গ যৌনতা সব পুরাণের উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত—এ কাহিনিতে তার দ্যোতনা আবিষ্কার করেছিলেন বুদ্ধদেব। জেসি ওয়েস্টন তাঁর From Ritual to Romance গ্রন্থে বলেছেন—"There is no doubt that ceremonial marriage very frequently formed a part of 'Fertility' ritual and was supposed to be specially efficacious in bringing about the effect desired." বৃষ্টি নামানোর জন্য, ফসলের উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য আদিম মানব সমাজে যে জাদুক্রিয়ামূলক আচরণ ছিল তার প্রধান উপচার ছিল একটি পুরুষ ও একটি নারীর যৌন মিলনের ভূমিকা। আদিম উপজাতি ওয়াট মাঙিস তাদের বসন্তকালীন উৎসবে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে ঝোপেঝাড়ে তাকে আবৃত করে তার চারদিকে উদ্যত বর্শা হাতে ঘুরে ঘুরে নাচত এবং সেই গুল্মাবৃত গহ্বর বিদ্ধ করতো তারা বর্শায়। বলা বাহুল্য, তাদের কাছেও এই আচরণবিধিতে গুল্মাবৃত গহ্বরটি স্ত্রী যোনি ও উদ্যত বর্শা ছিল পুরুষাঙ্গের প্রতীক। আদিমকাল থেকেই মানব সমাজের চেতনায় পুরুষের বীর্য এবং আকাশের বৃষ্টি পরস্পরের পরিপূরক। সেই বিশ্বাস থেকেই তরঙ্গিনীর সংলাপে রচিত হয় যৌনমিলনের শব্দচিত্র—

জাগ্রত হোক সুপ্তেরা। সুপ্ত হোক যারা জাগ্রত।

গলিত হোক শিলা। মুক্ত হোক প্রবাহ। ব্যাপ্ত হোক গতি।
পূর্ণ হোক বৃত্ত। জয়ী হোক প্রাণ। জয়ী হোক মৃত্যু।
ক্ষেত্রে বীজ, ক্ষেত্রে হল; গর্ভে বীজ, গর্ভে জল।
... ...
জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হলো যারা
জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হলো মনোরথ, উচ্ছল হলো
নির্ঝর। মেঘ জমলো আকাশে, চমক দিলো বিদ্যুৎ,
বিলোল হল বজ্র।
নামলো বৃষ্টি। জাগলো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। প্রাণ থেকে প্রাণে,
অঙ্গ থেকে অঙ্গে, তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণায়—প্রতিধ্বনি।
মৃত্তিকায় তৃষ্ণা, আকাশ দেয় তৃপ্তি। অন্তরীক্ষে তৃষ্ণা,
ধরণী দেয় তৃপ্তি। ...
তুমি আমার তৃষ্ণা, তুমি আমার তৃপ্তি।
আমি তোমার তৃষ্ণা, আমি তোমার তৃপ্তি।
সর্প তোলে ফণা ফেনিল হয় সমুদ্র
চলে মন্থন—মন্থন—মন্থন।
দীর্ণ মেঘ, তীব্র বেগ, রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ধরণী
বর্ষণ—বর্ষণ—বর্ষণ।

এইভাবে সুপ্রাচীন মিথকে যোগ্য আধারে প্রতিস্থাপন করেন কবি। ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর আখ্যান তাঁর কাছে হয়ে ওঠে এক আর্কেটাইপ, তাঁর অভিজ্ঞতা ও ধ্যানের যে যোগ্য আর্কেটাইপ ছিল তার অন্বিষ্ট। আবার মিথ-উদ্বৃত্ত নানা ঘটনা, যেমন ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহিত জীবনের অতৃপ্তি, বিষাদ অবসন্নতা কিংবা তরঙ্গিনীর সেই মুখশ্রীর সন্ধান। বস্তুত, একালের বন্ধ্যাত্ব অনুর্বরতা হতাশা কামপীড়িত যন্ত্রণার মধ্যে এক জীবনের আশ্বাসে উত্তরণের ইশারাই বুদ্ধদেব খুঁজে পেয়েছেন ঋষ্যরূপ পুরাণের মধ্যে।

৬.৪ তপস্বী ও তরঙ্গিনী ঃ আঙ্গিক-বিচার

প্রত্যেকটিতেই পাঁচটি করে অনু-দৃশ্য সম্বলিত চার অঙ্গে বিন্যস্ত 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'। আমরা একবার দেখে নিই এর ঘটনাক্রম—

প্রথম অঙ্ক

অণু-দৃশ্য ১. গাঁয়ের মেয়েদের গান থেকে প্রস্থান পর্যন্ত

২. রাজদূতদ্বয়ের সংলাপ থেকে প্রস্থান পর্যন্ত

৩. রাজমন্ত্রী ও রাজপুরোহিতের সংলাপ থেকে প্রস্থান পর্যন্ত

৪. শান্তার প্রবেশ ও প্রস্থান

৫. রাজমন্ত্রী ও লোলাপাঙ্গী-তরঙ্গিনীর কথোপকথন ও যবনিকাপাত পর্যন্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

১. ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে ঋষ্যশৃঙ্গের একোক্তি থেকে তরঙ্গিনীর একোক্তি পর্যন্ত

২. ঋষ্যশৃঙ্গের পুনরাগমন থেকে তরঙ্গিনীর প্রস্থান পর্যন্ত

৩. বিভাণ্ডকের প্রবেশ থেকে প্রস্থান অবধি

৪. ঋষ্যশৃঙ্গের স্বগতকথন থেকে তরঙ্গিনীকে আলিঙ্গানে আবদ্ধ করা ও মঞ্চে অন্ধকার নামা অবধি

৫. আবার মঞ্চে আলো জ্বলা থেকে বৃষ্টিপাত ও যবনিকাপতন পর্যন্ত

তৃতীয় অঙ্ক

১. ঋষ্যশৃঙ্গের যৌবরাজ্যে অভিষেকের ঘোষণা থেকে চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গীর প্রস্থানাবধি

২. লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিনীর কথোপকথন ও লোলাপাঙ্গীর প্রস্থানাবধি

৩. চন্দ্রকেতুসহ লোলাপাঙ্গীর পুনঃপ্রবেশ থেকে তরঙ্গিনীর কক্ষান্তর গমনাবধি

৪. চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গীর সংলাপ ও প্রস্থান পর্যন্ত

৫. তরঙ্গিনীর স্বগতোক্তি থেকে যবনিকাপতন অবধি

চতুর্থ অঙ্ক

১. রাজবেশে অলিন্দে দণ্ডায়মান ঋষ্যশৃঙ্গ-এই সূচনা থেকে শান্তার অন্তঃপুরে প্রস্থানবধি

২. বিভাণ্ডকের প্রবেশ ও প্রস্থান

৩. ঋষ্যশৃঙ্গের একোক্তি থেকে তরঙ্গিনীর প্রস্থান

৪. অংশুমান-শান্তার সংলাপ, রাজমন্ত্রী শান্তা ও অংশুমানের প্রস্থানবধি

৫. চন্দ্রকেতু ও লালাপাঙ্গীর প্রবেশ থেকে যবনিকাপাত পর্যন্ত

প্রথম অঙ্কের সূচনা গাঁয়ের মেয়েদের বৃষ্টির জন্য প্রার্থনাই—

আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু,
মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধুঁকছে, নির্বাক পশুরা;

শস্যহীন মাঠ, বন্ধ্যা সধবারা, দিনের পর দিন দীর্ণ, শূন্য—
বৃষ্টি নেই!

মেয়েদের এ সংলাপে দগ্ধ গ্রামাঞ্চলের বিশুষ্ক দীর্ণ শূন্য ছবি। শুধু শস্যহীনতার সমস্যাই নয়, তারা বুঝতে পারে না 'এ কোন্ অভিশাপ লাগলো!' তাই তাদের হাহাকার তীব্র হয়ে ওঠে বন্ধ্যা পাথুরে সভ্যতার পিপাসার কথায়। বুদ্ধদেব নিজেই বলেছেন এই অংশে 'রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিল এলিয়টের মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল নাটকটা'। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও জানিয়েছেন, 'The background of famine, village women, the exalted moment of the first exchange of glances between the boyish mendicant and sphisticated prostitute—all these were seized by the author's imagination in the light of Eliot's Murder in the Cathedral' (Buddhadev Bose, Alokranjan Dasgupta, Sahitya Akademi) 'বৃষ্টি নেই' এই আর্তি গিয়ে পৌঁছেছে তাদের সংলাপের শেষে 'বৃষ্টি দাও' এই প্রার্থনায়। ২০ পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত এই সংলাপে কে কোন্ অংশ বলবে তা' নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকে আমরা আগেই দেখেছি এ রীতি। তবে প্রযোজনার জন্য পরামর্শে বুদ্ধদেব এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকতে পারেননি, বরং আরম্ভের গাঁয়ের মেয়েদের প্রথম ভাষণটা কী-ভাবে আবৃত্তি করা হবে, সে বিষয়ে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম স্তবক ঃ প্রথম মেয়ে
দ্বিতীয় স্তবক ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ দ্বিতীয় মেয়ে
তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি ঃ তৃতীয় মেয়ে
তৃতীয় স্তবক ঃ প্রথম পঙ্‌ক্তি ঃ প্রথম মেয়ে
দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ দ্বিতীয় মেয়ে
তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ
'ব্যাঙের ছাতা কবে সাজাবে পৃথিবীরে?' ঃ তৃতীয় মেয়ে
'ডাকবে উল্লাসে দর্দুর' ঃ দ্বিতীয় মেয়ে
চতুর্থ পঙ্‌ক্তি ঃ প্রথম মেয়ে
চতুর্থ স্তবক ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ দ্বিতীয় মেয়ে
তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ তৃতীয় মেয়ে
চতুর্থ পঙ্‌ক্তি ঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেয়ে সমস্বরে
পঞ্চম স্তবক ঃ প্রথম পঙ্‌ক্তি ঃ প্রথম মেয়ে
দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ দ্বিতীয় মেয়ে
তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ তৃতীয় মেয়ে
চতুর্থ পঙ্‌ক্তি ঃ তিনজনে সমস্বরে

নাটকের প্রারম্ভেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে দেশে অনাবৃষ্টির সংবাদ। দুই রাজদূতের সংলাপ থেকে আরো

জানা যায় যে, এই দুর্ভিক্ষের প্রতিকারকল্পে রাজা লোমপাদ বিভিন্ন দেশের সাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্তু নানা দুর্বিপাকে সেসব সাহায্য পথিমধ্যেই বিনষ্ট হয়েছে—বঙ্গদেশ থেকে মহিষপৃষ্ঠে যা আসছিলো, দস্যুরা তা' হরণ করে নিলে। ঝড়ে ডুবলো তাম্রলিপ্তির অর্ণবপোত। কামরূপের বাহকেরা পরিণত হলো শ্বাপদের খাদ্যে। ..."

রাজপথগুলি দস্যুতে পরিকীর্ণ।
গ্রাম-সীমান্ত বন্য পশুতে উপদ্রুত।
কখনো দেখিনি এত মৃত মার্জার—
শৃগালের এমন বিকট চীৎকার কখনো শুনিনি।

সার্বিক এই বিনষ্টিতে ভীত ত্রস্ত প্রজার প্রশ্ন 'কী দোষ করেছি আমরা—কেন দেয়া নির্দয়'? 'কেন এই শাস্তি'? দূতদের কথায় চলে আসে গ্রীক পুরাণের কাহিনি, কখনো আসে দেবতায় সন্দেহ, ধর্মে অবিশ্বাস। তবে ব্রাহ্মণকে অপমান করার জন্য যে অঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ, এ সম্ভাবনা তারা নস্যাৎ করেছে। বরং ইঙ্গিত দিয়েছে এই বর্ষণহীনতা মোচনের—কোনো এক বারাঙ্গনাই হবে তাদের 'প্রাণদাত্রী'। রাজমন্ত্রী দূতদের আদেশ করে 'গণিকা লোলাপাঙ্গী ও তার কন্যা তরঙ্গিনীকে' রাজ্যে এনে উপস্থিত করতে। তরঙ্গিনী ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য ভঙ্গ করে তাকে রাজধানীতে নিয়ে এলেই বাঞ্ছিত বর্ষা আসবে। রাজপুরোহিতের উক্তিতে তারই ইঙ্গিত—

কুমার-অপাপবিদ্ধ-ঋষ্যশৃঙ্গ-তরুণ-
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তাঁর কৌমার্য্য;
রাজা যদি রিক্ত, তবে লুণ্ঠন করো তপস্বীকে,
সিক্ত হোক নারী ও পুরুষ, ব্যক্ত হোক মৃত্তিকার প্রতিভা।

শান্তার প্রবেশে অংশুমানের সঙ্গে তার প্রণয় সম্পর্কের বিষয়টি দর্শকের গোচরে আসে। অংশুমানের অঙ্কশায়িনী হতে উৎসুক শান্তা, কিন্তু দৈবাদেশে তাকে হতে হবে ঋষ্যশৃঙ্গের। রাজমন্ত্রী দেশের এই দুর্দিনে দেশেরই হিতৈষায় পুত্র অংশুমানকে দিনকয়েকের জন্য কারারুদ্ধ করতে দ্বিধা করেন না। কারণ ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনকালে শান্তাকে থাকতে হবে 'অনাহত ও প্রস্তুত'। আর বলেন 'তরঙ্গিনীর খ্যাতি যদি মিথ্যা না হয়, লোলাপাঙ্গীর অর্থলোভ যদি লেলিহান থাকে, তাহলে আবার সমৃদ্ধ হবে অঙ্গদেশ, কেউ থাকবে না বুভুক্ষু বা আর্ত। ... ঋষ্যশৃঙ্গকে রতিরহস্যে দীক্ষিত করবে তরঙ্গিনী; তার ফলভোগ করবে শান্তা।' ... মন্ত্রী ঠিকই বুঝেছিলেন, 'কাম একবার প্রজ্বলিত হলে সহজে থামে না'; আর এইভাবেই দ্বন্দ্বের বীজটি নাট্যক্ষেত্রে বপন করা হয়েছিল, প্রথম অঙ্কেই। এছাড়া, গদ্যের শরীরেও কাব্যিক বিভঙ্গ এনে কাব্যনাটকের যোগ্য পুরোভূমি তৈরি করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় এখানেই।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনা ঘটেছে ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে। প্রধান দুটি চরিত্র, তপস্বী ও তরঙ্গিনী এখানে উপস্থিত। তারপরে এসেছেন বিভাণ্ডক। পিতাপুত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তরঙ্গিনীকে একভাবে উপলব্ধি করবেন ঋষ্যশৃঙ্গ। এরপর তরঙ্গিনীর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গের সচেতন আত্মসমর্পণ ও তরঙ্গিনীর সঙ্গে তার

নগরগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামার পরিকল্পনায় এই অঙ্কের সমাপ্তি।

ঊষাকালে আশ্রমে দন্ডায়মান ঋষ্যশৃঙ্গের স্বগত-কথনে এই অঙ্কের সূচনা। সূর্য বায়ু বৃক্ষ চর আর জড় চেতন সকলকে তার বন্দনা, প্রণাম সেই পরম অব্যয় ব্রহ্মকে। তার প্রাত্যহিক ক্রিয়ার বর্ণনায় আমরা জেনে যাই ঋষ্যশৃঙ্গের শাস্ত্রনিষ্ঠ জীবনযাপন। কিন্তু মাঝে মাঝে এই কঠোর তাপসের মনেও জাগে কী এক অনির্দেশ্য বেদনা—

"... মর্ত্যলোকে কিছুই অবিচ্ছেদ নয়, আমারও মাঝে মাঝে আসে দুর্দিন। সেদিন মনে হয়, আমার দিনব্যাপী ক্রিয়াকর্ম যেন অভ্যাসমাত্র, কিছুই আমার অন্তঃকরণে অনুভূত হচ্ছে না। সেদিন অগ্নি দেয় না উজ্জ্বলতা, অনিল স্তব্ধ হয়ে থাকে, বেদমন্ত্র ধ্বনিত হয় না হৃদয়ে। আবার কোনো কোনোদিন স্বচ্ছ হয়ে যায় দৃষ্টি, সব মনে হয় সার্থক ও উজ্জীবিত, এক দিব্য বিভা চিদাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। আজ তেমনি একটি শুভদিন আমার।"

তারই আকাঙ্ক্ষার মধুর শব্দরূপ বাহিত হয় যেন দূরাগত বাঁশির সুরে, 'মরাল যেমন কৈলাসের জন্য আকুল,.... তেমনি আমার ঔৎসুক্য জাগছে', তারপর ঋষ্যশৃঙ্গাকে অভিভূত করে উপস্থিত হয় তরঙ্গিনী। জন্মাবধি পিতা ও শাস্ত্র, ধর্মাচরণ ও নিসর্গ ছাড়া আর কিছু জানে না ঋষ্যশৃঙ্গ। তাই তরঙ্গিনীকে তার মনে হয় 'চিন্ময় জ্যোতিঃপুঞ্জ'। বলে, — 'যে মনস্বীরা তিমিরের পারে আলোকময়কে দেখেছিলেন, আপনি যেন তাঁদেরই একজন।' বলে 'সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা, কটি যেন ঋক্‌ছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধরে বিশ্বকরুণার বিকিরণ। তাকে পাদ্যর্ঘ্য দিয়ে বন্দনায় উদ্যোগী হন ঋষ্যশৃঙ্গ।

'আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ তোমার চরণে' বারবার ধ্রুবপদের মতো উচ্চারিত হয় তরঙ্গিনীর সংলাপে। তখনও তরঙ্গিনী নিজের কার্যসিদ্ধির অহংকারে গর্বিত; আমরা পরে দেখবো, কি ভাবে এই শব্দমন্ত্র ভিতরে ভিতরে বদলে দিয়েছে তরঙ্গিনীকে। অনঙ্গাব্রতে তপস্বীকে আত্মদান করে তরঙ্গিনী, তার মন্ত্রের নাম রতি, যজ্ঞের নাম প্রীতি, ধ্যানের বিষয় আনন্দযোগ—আলিঙ্গানে চুম্বনে সে ব্রতপালন করে ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে যৌথভাবে। সে মিলনের শব্দচিত্র রচনায় বুদ্ধদেব বসুর দক্ষতা প্রশ্নাতীত।

'জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হলো যারা জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হলো মনোরথ, উচ্ছল হলো নির্ঝর। মেঘ জমলো আকাশে, চমক দিলো বিদ্যুৎ। বিলোল হল বজ্র। নামলো বৃষ্টি। জাগলো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। প্রাণ থেকে প্রাণে, অঙ্গ থেকে অঙ্গে, তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণায়—প্রতিধ্বনি। মৃত্তিকায় তৃষ্ণা, আকাশ দেয় তৃপ্তি। অন্তরীক্ষে তৃষ্ণা, ধরণী দেয় তৃপ্তি। সাগর থেকে বাষ্প, বাষ্পে জমে মেঘ, মেঘ নামে বর্ষণে। বিদ্যুৎ জ্বলে অঙ্গ থেকে অঙ্গে, শোণিতে জাগে জ্বালা, বজ্রপাতে চূর্ণ হয় চেতনা। এসো তিমির, এসো তন্দ্রা, এসো দাবানল, এসো ধারাজল। তুমি আমার তৃষ্ণা, তুমি আমার তৃপ্তি। আমি তোমার তৃষ্ণা, আমি তোমার তৃপ্তি। সর্প তোলে ফণা, ফেনিল হয় সমুদ্র। চলে মন্থন—মন্থন—মন্থন। দীর্ণ মেঘ, তীব্র বেগ, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ধরণী। বর্ষণ—বর্ষণ—বর্ষণ।'

নারী-পুরুষের যৌন মিলনের এ এক কাব্যময় চিত্রল বর্ণনা। তৃষ্ণা তৃপ্তি, তৃপ্তি তৃষ্ণা শব্দের উপর্যুপরি

ব্যবহার, মেঘ বর্ষণ বিদ্যুৎ বজ্র, দাবানল, ধারাজল এইসব শব্দের, কিংবা বলা যায় বিপরীত শব্দের সার্থক প্রয়োগে, ফণা-উদ্যত সর্পের প্রতিমায়, মন্থনক্ষুব্ধ ফেনিল সমুদ্রের ছবিতে ঋষ্যশৃঙ্গের এবং তরঙ্গিনীর মিলনকে শব্দচিত্রে উপস্থাপন করেছেন কবি।

বিভান্ডকের প্রবেশে স্বভাবতই ক্ষুণ্ণ হয় এই মায়াবী আবহ। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের অভিভবের গাঢ়তায় মিশে যায় এক অ-পূর্ব অভিজ্ঞতা। ভাবান্তরিত ঋষ্যশৃঙ্গ বলেন, তপোবনে সেদিনের অতিথি 'এক আশ্চর্য ব্রহ্মচারী। দীর্ঘকায় নন, খর্বকায় নন, দেবতার মতো কান্তিমান। কনকতুল্য তাঁর বর্ণ, দেহ সুঠাম ও সংকেতময়; ... শঙ্খের মতো গ্রীবা, ... আনন যেন উদ্ভাসিত ঊষা; ... তাঁর বাহু, বক্ষ ও পদযুগল নির্লোম, বক্ষে দুটি মনোহর মাংসপিন্ড নৈবেদ্যের মতো বর্তুল। ...' '... আমার দেহে জাগলো অজ্ঞাতপূর্ব পুলক, আমার সত্তায় সঞ্চারিত হলো অমৃতশ্পর্শ...' ঋষ্যশৃঙ্গ জানলো 'সে নারী'। 'নূতন নাম, নূতন রূপ, নূতন ভাষা। নূতন এক জগৎ। ...' ঋষ্যশৃঙ্গ, বিরহক্লিষ্ট ঋষ্যশৃঙ্গ চাইল সেই 'মোহিনী মায়াবিনী ঊর্বশী' নারীকে, তার পিতার নিষেধ সত্ত্বেও।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি নারী।

তরঙ্গিনী। কুমার, আমি তোমার সেবিকা।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি আমি কে। আমি পুরুষ।

তরঙ্গিনী। তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।

তরঙ্গিনী। আমার হৃদয়ে তুমি রত্ন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার শোণিতে তুমি অগ্নি। ...

তরঙ্গিনী। বলো, তুমি চিরকাল আমার থাকবে!

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি তোমাকে চাই—তুমি প্রয়োজন!

তরঙ্গিনী। তবে চলো-চলো আমার সঙ্গে। ...

ঋষ্যশৃঙ্গ। কোথায় যাই কী এসে যায়? কোথায় থামি কী এসে যায়? আমি চাই তোমাকে। আমি চাই তোমাকে।

তরঙ্গিনী। এসো প্রেমিক, এসো দেবতা—আমাকে উদ্ধার করো।

ঋষ্যশৃঙ্গ। এসো দেহিনী, এসো মোহিনী—আমাকে তৃপ্ত করো।

এই পারস্পরিক কথোপকথনে একটু কান পাতলেই শোনা যায় তপস্বী ও তরঙ্গিনীর রূপান্তরের অনুভব। একদিকে ঋষ্যশৃঙ্গের আজন্মের সাধনা, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সুকঠিন তপস্যা, আরেকদিকে সদ্য-পরিচিত নারীর দেহমনের মোহিনী বৈভব—এর কোন্ দিকে যাবেন তিনি? "তাঁর চিত্তে নিশ্চয়ই দুই চৈতন্যের সংঘর্ষ হয়েছিল। নিশ্চয়ই দীর্ঘক্ষণ দ্রুত শোণিত সঞ্চালিত হৃৎপিন্ডের ধ্বনি তাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল, কোন দিকে তিনি যাবেন। তপস্যা, সংযম, ব্রহ্মজ্ঞান, পিতার উপদেশ নাকি নারী মোহিনী মায়াবিনী। একদিকে আশৈশব আচরিত

তপস্যা অন্যদিকে অকস্মাৎ বিস্ময়"।

বলা বাহুল্য, উভয়ের সংলাপে ভাবান্তরের যে সূত্রটুকু আছে তা পরবর্তী পর্যায়ে আরো স্পষ্ট হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে দেখা যাবে বিবর্তিত তরঙ্গিনী ও ঋষ্যশৃঙ্গাকে। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে মঞ্চে অস্পষ্ট আলোয় মুহূর্তের জন্য দেখা যাবে আলিঙ্গানাবদ্ধ তপস্বী ও তরঙ্গিনীকে। তারপর অন্ধকার। আবার মঞ্চে আলো জ্বললে চম্পানগরের রাজপথে বৃষ্টিমুখরিত পরিবেশে নারীপুরুষের হর্ষধ্বনির মধ্যে তরঙ্গিনী ও তার সখীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের রঙ্গামঞ্চ পার হয়ে যাওয়ার দৃশ্য।

তৃতীয় অঙ্কের শুরুতেই রাজপথপাশে তরঙ্গিনীর গৃহাভ্যন্তরে দেখা যাবে বিস্রস্ত যত্নহীন উন্মনা এক নারীকে, সে তরঙ্গিনী। রাজপথে ঘোষক রাজাদেশ ঘোষণা করে, 'আগামী মঙ্গালবার, শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে, পুষ্পা নক্ষত্রে, মহারাজ তাঁর জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।' এ সংবাদে প্রথম প্রতিক্রিয়া তরঙ্গিনীর অস্ফুট অথচ তীব্র উচ্চারণে 'লোমপাদের জামাতা। যুবরাজ!' পুরবাসী উল্লসিত কেননা তাদের গোলা-ভরা ধান, পুকুর-ভরা মাছ। বিমর্ষ চন্দ্রকেতু আর অংশুমান। উভয়েরই ক্ষোভ-বিষাদের উৎসে রয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী, যদিও ভিন্নভাবে, কিংবা বলা যায়, তাদের বিরাগের লক্ষ্য একজনই, সে ঋষ্যশৃঙ্গ। কেননা, ঋষ্যশৃঙ্গাকে মোহিত করার পর তরঙ্গিনী 'নিজে আর স্বচ্ছ নেই'। চন্দ্রকেতু আর তার নাগাল পায় না। আর তরঙ্গিনী কৌমার্যভ্রষ্ট ঋষ্যশৃঙ্গাকে নগরে নিয়ে আসাতেই শান্তাকে হারাল তার প্রেমিক অংশুমান। দুই তরুণেরই তাই মনের কথা—'যদি ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম কখনো না-হতো! যদি এখনো ঋষ্যশৃঙ্গের অস্তিত্ব মুছে যায়!'

চন্দ্রকেতু বৃদ্ধা লোলাপাঙ্গীকে উপহার দেয়, তরঙ্গিনীর কাছে পৌঁছবার জন্য। লোলাপাঙ্গী আর তরঙ্গিনীর কথোপকথনে উন্মোচিত হয় জীবনের আরো কিছু সত্য। লোলাপাঙ্গী তখন একইসঙ্গে জননী আর দূতীর ভূমিকা পালন করেছে, কিংবা দূতীর ভূমিকা হয়তো একটু বেশিই পালন করেছে। 'চন্ডালিকা'র প্রকৃতির জননীর মতো তারও কন্যার কাছে যেন একই প্রশ্ন 'বাছা মন্ত্র করেছে কে তোকে?' বহুভোগ্যা সে বৃদ্ধা অর্থ বোঝে, রত্ন চেনে, রূপ ভোগ করে; শুধু বুঝতে পারছে না ছলনাবৃত্তি পালন করতে গিয়ে কিভাবে বদলে গেল তরঙ্গিনীর সমস্ত জীবন, এক জন্মেই কিভাবে জন্মান্তর ঘটে গেলো তার। তরঙ্গিনী বুঝতে পারে অঙ্গাদেশে বৃষ্টি আনার জন্য সে যন্ত্র বা উপায় রূপে ব্যবহৃত। পরাজয়ের বেদনায় সে ম্লান। ঋষ্যশৃঙ্গ বিভান্ডককে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন ছিলেন তার জননী? তরঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করে লোলাপাঙ্গীকে হঠাৎই—'মা, আমার পিতা কে ছিলেন তা কি তুমি জানো?' লোলাপাঙ্গী স্মরণ করে তার বিগত যৌবনের কথা, আর তরঙ্গিনী সে-কথার ফাঁকে উচ্চারণ করে তার প্রেমানুভূতি—" ...প্রথম যখন দেখা হলো—তিনি কি মুগ্ধ ছিলেন? কেমন করে তাকাতেন তোমার দিকে? তোমার মনে পড়ে? কখনো কি তোমাকে বলেছিলেন—'তুমি ছদ্মবেশী দেবতা, তুমি মূর্তিমতী আনন্দ?' তোমার মনে পড়ে? ... তুমি কি কেঁপে উঠেছিলে, তাঁর চোখে তোমার চোখ পড়লো যখন তোমার কি তখন মনে হয়েছিল তুমি অন্য কেউ?"

চন্দ্রকেতুর সঙ্গে সংলাপে আরো স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে ঋষ্যশৃঙ্গ ছাড়া অন্য সব পুরুষই এখন তরঙ্গিনীর কাছে ম্লান, সাধারণ, আভ্যাসিক জীবনের শৃঙ্খলে বাঁধা। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে সেই বিনিড় মুহূর্তের অনুভূতির স্মৃতিতে সর্বদা স্নাত তরঙ্গিনী, সে কি করে আর গ্রহণ করবে অন্য পুরুষকে! তরঙ্গিনীর তখন

কাম্য আনন্দ, প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ। 'আমি চাই সেই দৃষ্টি, যার আলোয় আমি নিজেকে দেখতে পাবো। দেখতে পাবো আমার অন্য মুখ, যা কেউ দ্যাখেনি, অন্য কেউ দ্যাখেনি।' যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে তার এ উক্তি, তারপর চন্দ্রকেতুর কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ।

তরঙ্গিনীর কক্ষান্তরগমনের পর চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গীর কথাবার্তায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তরঙ্গিনী এক দুর্বোধ্য অসুখের শিকার। হয়তো বা ঋষির তপোভঙ্গের কারণেই তাঁর দ্বারা অভিশপ্ত সে, শিবের তপোভঙ্গের কারণে মজনঙস্মের ঘটনাটি উল্লেখ করে চন্দ্রকেতু তার বক্তব্যকে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রার্থীদের দর্শন দেবার সময় তাঁর কাছেই যে তারা প্রতিষেধক চাইবে, এ কথা জানা যায় ঘোষকের ঘোষণার পরেই। চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গীর নিভৃত পরামর্শের জন্য স্থানান্তর গমনের পরই রঙ্গামঞ্চে আবার প্রবেশ করে তরঙ্গিনী। এবারে সে সুসজ্জিতা প্রসাধিতা, অবিকল দ্বিতীয় অঙ্কের মতো তার বেশ এবং হাতে একটি স্বর্ণখচিত দর্পণ। তরঙ্গিনী যে ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে গ্রস্ত তা' বোঝাতেই যেন এই অংশের পরিকল্পনা। দর্পণে প্রতিবিম্বিত আত্মরূপ দেখে তরঙ্গিনীর দীর্ঘ একোক্তির মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার মনস্তাত্ত্বিক সংকট অনবদ্য এক ভাষায়—দর্পণ, বল, সে কি আমার চেয়েও রূপসী? সে কি দীর্ঘাঙ্গী আমার চেয়ে? আরো তন্বী? তার অধর আরো রক্তিম? বক্ষ আরো সুগন্ধি? ... অঙ্গে-অঙ্গে লাস্য আরো উচ্ছল? ... রাজকুমারী শান্তা! জামাতা! যুবরাজ! তুমি কি তৃপ্ত? ... আমি রিক্ত, আমি সর্বস্বান্ত। ... (দর্পণে গভীরভাবে তাকিয়ে) এই কি সেই মুখ, যা তুমি দেখেছিলে? 'তাপস, তুমি কে? কোনো স্বর্গের দূত? কোনো ছদ্মবেশী দেবতা?' এই মুখ, এই দেহ, এই বসন, এই অলংকার। তুমি কি আমাকেই দেখেছিলে? এই আমাকে? ...

আর কেন দৃষ্টিপাত করো না? আমি স্বপ্নে দেখি তোমার দৃষ্টি—জাগরণে দেখি তোমার দৃষ্টি। কিন্তু তুমি যা দেখেছিলে তা আমি দেখি না কেন? ...

বল, দর্পণ, সে কে? এক মুখ—একই মুখ ফুটে ওঠে বার-বার—অন্য মুখ নেই? ... মিথ্যাবাদী! ... (দর্পণ ছুঁড়ে ফেললো।)

আমি কি তবে স্বপ্ন দেখেছিলাম? সব কি আমার মতভ্রম—সেই আকাশ, তরুণ সূর্য, আমার হৃদয়ে সেই সূর্যোদয়? না-মতিভ্রম নয়—নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর বাস্তব। তিনি আজ যুবরাজ—তিনি আজ লোকপাল। ...'আমি তোমাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবো।' পাপিষ্ঠা, কপটভাষিণী, পারলি কই? অন্যের হাতে অর্পণ করলি, সঁপে দিলি শান্তার বাহুবন্ধে!

তরঙ্গিনীর আকুতি যেন তীব্র হাহাকারে উচ্চকিত হয়ে ওঠে—

প্রিয়, আমার প্রিয়, আমার প্রিয়তম, কেন আমি তোমাকে নিয়ে চ'লে যাইনি—দূরে, বহুদূরে যেখানে শান্তা নেই, লোলাপাঙ্গী নেই, চন্দ্রকেতু নেই—

দীর্ঘ এই সংলাপে আমরা দেখি কিভাবে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় তরঙ্গিনীর মনোভবনের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ! কাব্য ও নাটকের যথার্থ মেলবন্ধন এখানে ঘটেছে। তরঙ্গিনীর লজ্জা, গর্ব, যন্ত্রণা; তার আনন্দস্মৃতি বিষাদ দুঃখ, তার জয়, তারই পরাজয়, আত্মধিক্কার। তার ঈর্ষা এবং অহংকারী আত্মরতি পর্যায়ক্রমে অভিব্যস্ত হয়েছে

তার একোক্তিতে। আর তা' চূড়ান্ত শীর্ষ স্পর্শ করেছে তখনই যখন তরঙ্গিনী বলে উঠেছে—

... আমি পারি—এখনো পারি—এখনো আমি তরঙ্গিনী। ... আমি, তরঙ্গিনী, তপস্বীকে লুণ্ঠন করেছিলাম, আর আজ কি এক তুচ্ছ জামাতাকে জয় করতে পারবো না!

তরঙ্গিনীর উচ্চ হাসির মধ্যে নেমে আসতে থাকে মঞ্চের যবনিকা। তরঙ্গিনী আবার কি পারবে ঋষ্যশৃঙ্গাকে জয় করতে?—দর্শকের এই কৌতুহল নাটকীয় সম্ভাবনায় আর একবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠার মধ্যেই তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তি।

তৃতীয় অঙ্ক যেখানে তরঙ্গিনীর মানসতা প্রকাশ করেছে, চতুর্থ ও শেষ অঙ্ক সেখানে মুখ্যত ঋষ্যশৃঙ্গের আত্মানুসন্ধানের কথাই বলেছে। বাইরে আকাশে পড়ন্ত বেলা। রাজপ্রাসাদের অলিন্দে রাজবেশে ঋষ্যশৃঙ্গ দণ্ডায়মান, কক্ষাভ্যন্তরে উপবিষ্ট শান্তা কেশপ্রসাধনরত, তার সামনেও দর্পণ। অর্থাৎ দর্পণে আত্মপ্রতিকৃতি কি চরিত্রগুলির আত্মোপলব্ধির সহায়ক হিসেবে প্রযুক্ত হচ্ছে? ঋষ্যশৃঙ্গের দর্শনলাভে ধন্য পুরবাসী। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে এ-সব কিছু নিরর্থক, বিস্বাদ—

বিস্বাদ—বিস্বাদ এই রাজপুরী, বিস্বাদ জনতা, আমার মন্ত্রপুত বিবাহ বিস্বাদ,

বিবর্ণ দিন, তিক্ত কাম, উৎপীড়িত রাত্রি।

আমি যেন পিঞ্জরিত জন্তু, জীবনের বলাৎকারে বন্দী।

ওরা জানে না, কেউ জানে না—আমি দেখি অন্য এক স্বপ্ন।

শান্তার গান আর ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপ পরপর বিন্যস্ত। কক্ষ এবং অলিন্দের ব্যবধান তো খুব বেশি ছিল না। কিন্তু এই গান আর কথা তারা পরস্পর কি শুনতে পেলো না? হয়তো বুদ্ধদেব দেখাতে চেয়েছেন, উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান খুব বেশি না হলেও মানসিকতার ব্যবধান দুস্তর। একইকালে ঋষ্যশৃঙ্গ ভাবছে 'সেই আবির্ভাব—সেই আবির্ভাব—সেই ঊষা—সেই উন্মোচন।/... আমার রক্তে আগুন, রোমকূপে বিদ্যুৎ, শ্রবণে উতরোল সমুদ্র।/... তার আলিঙ্গনে লুপ্ত হয়ে, তার বৈভবের অন্তরালে। ...' আর শান্তা কাতর তার প্রণয়ী অংশুমানের জন্য—

আসে যায় দিন-রজনী
আসে জাগরণ তন্দ্রা
শুধু নেই হৃৎস্পন্দন,
লুণ্ঠিত সব স্বপ্ন।

উভয়েই আত্মমগ্ন তাদের নিজস্ব অনুভবে। সুরে আর স্বরে এখানে সংলাপে বৈচিত্র্য এসেছে।

অলিন্দে শান্তার প্রবেশ, স্বামীর সঙ্গে তার কথোপকথনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজপুরীর গতানুগতিক জীবনের ক্লান্তিকর দিক। ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের সেই অপাপবিদ্ধ সত্যবাদী সরল মুখ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। শান্তার সঙ্গে তাঁর বার্তাবিনিময় সতর্ক সুচতুর, কৃত্রিম। ঋষ্যশৃঙ্গ যেখানে শান্তার বেশবাসের প্রশংসা করেন, তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে কথা বলেন, তখন বোঝা যায় 'নাগরিক' 'যুবরাজ' দ্রুত কথা শেষ করতে আগ্রহী। শান্তাকে প্রসাদননিমিত্ত অন্তঃপুরে পাঠিয়ে আরো কিছু মুহূর্ত ঐ সূর্যাস্তকালে একা আত্মসাৎ করতে চান ঋষ্যশৃঙ্গ।

এরপরই বিভাণ্ডকের প্রবেশে পিতা-পুত্রের সংলাপে উদ্‌ঘাটিত হয় আর এক সত্য। পিতা এসেছেন পুত্রকে তপোবনাশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ অসম্মত—'আমি আজ যুবরাজ'। যৌবরাজ্যের সমাদর-সম্মান ছেড়ে যেতে চান না তিনি। কিন্তু শুধু কি তাই? বিভাণ্ডকের ভর্ৎসনার উত্তরে ঋষ্যশৃঙ্গ স্পষ্ট করে দেন পিতার 'পতন', যেদিন লোমপাদের কাছ থেকে পনেরটি গ্রাম আর পৌত্রের রাজ-উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে প্রশমিত হয়েছিল বিভাণ্ডকের রোষানলে। ঋষ্যশৃঙ্গ তো তারই 'সুযোগ্য' পুত্র। ঋষ্যশৃঙ্গ দেখলেন তার পিতাও 'অলঙ্ঘনীয় নিয়তি' বশত 'পাপের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেছেন'। তার উচ্চারণ তাই নির্মম, তিক্ত, বিরক্ত। ঋষ্যশৃঙ্গ পিতাকে ফিরিয়ে দেন, না রাজৈশ্বর্য তার কাম্য নয়, কাম্য নয় ব্রহ্মসাধনাও। ঋষ্যশৃঙ্গ আরো কিছু খোঁজেন যেন দৃঢ় শপথের মতো উচ্চারণ করেন—

'কিন্তু আমারও কিছু প্রয়োজন আছে পিতা। আমি চাই—... কী চাই, জানি না। ... না, আমি ফিরে যাবো না। আমি এখানেই থাকবো। অন্য এক প্রতীক্ষায়—অন্য এক প্রতিজ্ঞায় আমি আবদ্ধ। ...'

বিবর্ণ বিফল মনোরথ বিভাণ্ডক ফিরে গেলেন, ঋষ্যশৃঙ্গ নিয়োজিত হলেন আত্মানুসন্ধানের আরেকদিকে—'পতি—পিতা-যুবরাজ-আমি? ব্রহ্মচারী—বনবাসী—আমি? না—না—আমি তোমার। অসহ্য নগর—অসহ্য জনতা—কিন্তু এখানেই আমার অপেক্ষা—তোমার জন্য। তোমার জন্য।' আত্মপীড়নের মধ্যে দিয়েই ঋষ্যশৃঙ্গ নিজেকে চিনতে চেয়েছেন ক্রমশ।

এরপরই অংশুমানের প্রবেশ, ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি তার সরাসরি অভিযোগ এবং অংশুমান ও শান্তার সংলাপের মধ্যে দিয়ে অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবেই উভয়ের সম্পর্ক উন্মোচিত হবে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে। সহজভাবেই বরণ করেছেন এই সত্যকে। নাটকীয়তার আরো এক স্তর ঘনীভূত হয়েছে লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর আগমনে। এদের বিপন্নতা তরঙ্গিনীর দুর্বোধ্য অসুখ নিয়ে। একসময় নিজের অজ্ঞাতসারেই ঋষ্যশৃঙ্গ উচ্চারণ করেছিলেন সে নাম—'তরঙ্গা থেকে তরঙ্গে আমি চঞ্চল'—আর আজ জরতী গণিকার কাছ থেকে শুনেছে তরঙ্গিনী নাম্নী এক বারাঙ্গনাই রাজমন্ত্রীর নির্দেশে ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যহরণ করেছিল, 'তরঙ্গিনী। তার নাম তরঙ্গিনী'। এরই মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্কের মতো সেই লাস্যময়ী বেশে অলংকৃতা তরঙ্গিনী প্রবেশ করে রঙ্গামঞ্চে। দাঁড়ায় একেবারে ঋষ্যশৃঙ্গের সামনে, বলে—

'...আমি তোমাকে আর একবার দেখতি এলাম। আমাকে তুমি চিনতে পারছো না?...' তারপর বদলে যায় তার স্বরভঙ্গি—

'তোমার দৃষ্টি আজ অন্যরূপ কেন? তোমার সঙ্গে কেন বল্কল নেই? কেন তোমার চোখের কোলে ক্লান্তি?'...

চম্পানগরে প্রবেশের পর প্রায় বৎসরকাল অতিবাহিত হয়েছে, ঋষ্যশৃঙ্গ পিতা হয়েছেন, কেন এর মধ্যে তিনি সেই নারীর খোঁজ করলেন না বা তরঙ্গিনীরই কেন যুবরাজের কাছে পৌঁছতে এত সময় লাগল, কোনো কোনো সমালোচক সে প্রশ্ন তুলেছেন। বলা বাহুল্য, বুদ্ধদেব অতি দ্রুত যেন নাট্যসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন। তরঙ্গিনীর এই অভিসারে শান্তা কিংবা অংশুমান বিরক্ত হয়, চন্দ্রকেতু, লোলাপাঙ্গী বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু সকলকে স্তব্ধ করে দিয়ে উচ্চারিত হয় ঋষ্যশৃঙ্গের স্বীকারোক্তি—

'...শোনো—আমি সকলের সামনে বলছি, এই যুবতী আমার ঈপ্সিতা। এই অঙ্গদেশ যেখানে আমি হর্ষধারা নামিয়েছি, আমি সেখানে শুষ্ক ছিলাম। দগ্ধ ছিলাম তারই বিরহে, তোমরা যাকে তরঙ্গিনী বলো। আমি জানতাম না কাকে বলে নারী, আমি যে পুরুষ তাও জানতাম না। সে আমাকে জানিয়েছিলো। আমি তাই কৃতজ্ঞ...। সে আমার পরিত্যাজ্যা নয়, সে আমার—অন্তরঙ্গা। তার কাছে—অঙ্গদেশে একমাত্র তার কাছে আমি ত্রাতা নই, অনুদাতা নই, যুবরাজ নই, মহাত্মা নই—... কোনো উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নই আমি। একমাত্র তারই কাছে আমি অনাবিলভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ।...'

এতদিনে তিনি স্বীকার করেছেন, রাত্রে অন্ধকারে বাহুবন্ধে ধরা দিত যে শান্তা, সে-মুহূর্তে ঋষ্যশৃঙ্গ ভাবত, সে শান্তা নয়, 'সেই অন্য নারী'। হয়তো শান্তাও ঋষ্যশৃঙ্গাকে কল্পনা করত অংশুমান রূপে। এইভাবে এতদিনে আত্ম-উপলব্ধির বিশেষ স্তরে উপনীত হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। তরঙ্গিনী একদিন ঋষ্যশৃঙ্গাকে সারল্যের স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করেছিল, আজও সে তাকে মুক্তি দিল আত্মপরতার সংকীর্ণতা থেকে। যে মুখ বারবার দেখতে চাইল তরঙ্গিনী তা ঋষ্যশৃঙ্গাকে প্রথমে সংশয়-বেদনায় কাতর করলেও পৌঁছে দিল প্রশান্তিতে। রাজবেশ বদল করে ঋষ্যশৃঙ্গ পরিধান করলেন তপস্বীর বল্কল, শান্তাকে ফিরিয়ে দিলেন কৌমার্য, অংশুমানকে রাজত্ব, তারপর বেরিয়ে পড়লেন পথে—বললেন—'আমি ঘুমন্ত ছিলাম, সে আমাকে জাগিয়েছিল। আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ছিলাম, আবার আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলো সে। সেই আমার বন্ধন। সে-ই আমার মুক্তি। আমার সর্বস্ব'। অন্ধকারে শূন্যতায় ডুবতে চেয়ে তার পথচলা। তরঙ্গিনীকে সে সঙ্গে নিল না, আশ্রম তার গন্তব্য নয়।

'কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে, তরঙ্গিনী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হয়ে গিয়েছি। আমাকে সব নূতন করে ফিরে পেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানি না, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। ... কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে তরঙ্গিনী। ... বাধা দিয়ো না, ... তুমি তোমার পথে যাও। হয়তো জন্মান্তরে আবার দেখা হবে।'

ঋষ্যশৃঙ্গ অলিন্দ পার হয়ে চলে গেলেন। চলে গেল তরঙ্গিনীও তার সব অলংকার ত্যাগ করে— আত্ম-আবিষ্কারের পথে দু'জনেরই যাত্রা শুরু হল। শান্তা-অংশুমান বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। চন্দ্রাকেতু লোলাপাঙ্গী জীবনযাপনেরই কোনো এক অমোঘ আকর্ষণে পরস্পরের অবলম্বন হয়ে রয়ে গেল।

প্রয়োজনার জন্য পরামর্শে বুদ্ধদেব চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্রায়ণের গভীরতার কথা বলেছেন, বলেছেন চরিত্রটির যথার্থ পরিস্ফুটন শ্রমসাধ্য কেননা বিভিন্ন ভাবের সন্নিপাতে 'দ্বিতীয় অঙ্কের সরল তপস্বী এখন জটিল সাংসারিক চরিত্র হয়ে উঠেছেন।' তাছাড়া এই অংশে '... যেন দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাটি উল্টে গেলো—অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গোই চাইলেন তরঙ্গিনীকে 'ভ্রষ্ট' করতে, আর তরঙ্গিনী খুঁজলো ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে সেই স্বর্গ যা দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ তার মুখে দেখেছিলেন এবং যার পুনরুদ্ধারে সে বদ্ধপরিকর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঋষ্যশৃঙ্গাই তরঙ্গিনীকে বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা। নায়ক-নায়িকার এই বিবিধ পরিবর্তন-প্রসূত উদ্বর্তন যতটা কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা যাবে ততটাই এই নাট্যাভিনয়ের সাফল্যের সম্ভাবনা।'

বলেছেন বুদ্ধদেব, লোলাপাঙ্গী চরিত্রটিও যেন কখনোই 'কমিক' হয়ে না ওঠে, 'সমগ্র নাটকে তার বেদনার দিকটা ভুলে গেলে চলবে না', অর্থলোভ ও প্রগল্‌ভতা যেমন তার স্বভাবসিদ্ধ, মাতৃস্নেহও তারঅকৃত্রিম। কিন্তু জীবনের গ্রাস শেষপর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য। তাই সচেতনে-অচেতনে আত্মপ্রতারণা কিছুটা করলেও তাদের বেঁচে থাকতে হবে, তরঙ্গিনীকে হারাবার পরও। তারা অনুকম্পার যোগ্য কিন্তু উপহাসাস্পদ নয়।

বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'লোকেরা যাকে কাম নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দু'জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো—নাটকটির মূল বিষয় হলো তাই।' তপস্বী ও তরঙ্গিনীর ক্ষেত্রে একথা এককভাবে সত্য, কিন্তু নাটকের শেষে অন্য চরিত্রগুলি যেমন লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর ক্ষেত্রেই সত্য নয়। আসলে, একদিক থেকে এ তপস্বী ও তরঙ্গিনীর আত্ম-অন্বেষণের নাটক, কাম থেকে তাদের যাত্রা শুরু প্রেমে, তাদের উত্তরণ। শেষপর্যন্ত পার্থিব সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে নিরুদ্দেশের পানে যাত্রা, নতুন লক্ষ্যপথের সন্ধানে। 'জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে নিজেকে খুঁজে পাবার জন্য,' সেদিকে লক্ষ রেখেই চারটি অঙ্ক পরিকল্পিত নানা অনু-দৃশ্যের সমবায়ে। বিচ্যুতি নেই এমন নয়, কিন্তু চরিত্র-পরিকল্পনায়, আবহরচনায়, সংলাপের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে কাব্যনাটকের উপযোগী পরিবেশ গ্রন্থনে নাট্যকারের নৈপুণ্য অনস্বীকার্য।

৬.৫ কাব্যনাট্য হিসেবে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী

সাধারণ বিবেচনায় কাব্যে লেখা নাটককেই কাব্যনাটক বলা যায়। কাব্যনাটক বা কাব্যনাট্য, ইংরেজিতে Verse Play বা Poetic Drama-র সাধারণ অর্থ তাই। কিন্তু ছন্দে রচিত রচনামাত্রই যেমন কবিতা নয়, তেমনই নাটক কাব্য লেখা হলেই তা' কাব্যনাটক হয় না। কাব্য ও নাটক—উভয়েরই শর্তপূরণ এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মস্থ ও অপরিহার্য হয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে যে শিল্পমাধ্যম তাই কাব্যনাটক। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রারম্ভিক কাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী বন্ধ্যা নাট্যকলার প্রতিক্রিয়ার ফলে এলিয়ট প্রমুখের মধ্য দিয়ে কাব্যনাটকের তত্ত্ব ও প্রকরণের বহুল প্রচার ঘটে। কিন্তু আদিতে পৃথিবীর দুটি শ্রেষ্ঠ নাট্যযুগ, গ্রীক ও এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকলাই ছিল কাব্যনাটকের। যদিও তখন কাব্যনাটক কথাটির পৃথক প্রচলনের প্রয়োজন হয়নি, কারণ কাব্যে নাটক রচনাই ছিল তখনকার সাধারণ রীতি।

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাস্তবতার দাবিতে ইবসেন প্রমুখর নাট্যচর্চায় গদ্যভাষা ব্যবহৃত হলো, কিছু পরেই আবার ইবসেন কিংবা বার্নাড শ'-এর সমাজচর্চাকে ঈষৎ অগ্রাহ্য করে পরা-বাস্তব-সন্ধানী প্রতীকসম্বল এক লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব হলো। তাঁরা শুধু পদ্যভাষা নয়, মঞ্চে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন কবিতাকে। ক্রমশ এক নতুন অর্থে কবিতা হলো নাটকের অপরিহার্য অন্বেষণ। কেননা, রহস্যময় আত্মিক এবং সাঙ্গীতিক জগতের ধ্যান ও সন্ধান, এই হলো ইয়েটস্ প্রমুখ নাট্যকারদের বিষয় বা থিম। এই বিষয়ের জন্য যোগ্য ভাষা প্রয়োজন, কবিতার মেদুরতা তাই অত্যাবশ্যক। প্লট বা কাহিনি এ-সব রচনার পক্ষে গৌণ হয়ে এলো, গভীরতর সত্যসন্ধানের উপযুক্ত থিমই তখন পুরোবর্তী হয়ে দেখা দিল। কাব্যনাট্যে গদ্যভাষাও ব্যবহৃত হতে পারে কিনা তা-ও বিবেচ্য হলো। বিশেষত, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে এলিয়টের Murder in the Cathedral প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য-নাট্যের নতুন যুগ দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমি অর্জন করল। ইয়েটসের রচনায় কবিতার আধিপত্য, বিপ্রতীপে নাট্যস্বভাবে লিয়ট সাধারণভাবে অনেকখানি অগ্রসর।

বস্তুত, যে-কোনো মুহূর্তে ভাবনা বা অনুভব অনুকূল গাঢ়তায় প্রবেশ করতে পারে, এমন কাব্যভাষা নির্মাণ করতে হবে কাব্যনাট্যে। তার জন্য স্থিতিস্থাপক, নম্য এক ছন্দের প্রয়োজন এবং এর দ্বারা একদিকে যেমন নাটকে জীবনচিন্তার সাময়িকতা ও কবিকল্পনার চিরন্তনতা যুক্ত হবে, অন্যদিকে তেমনই কবিতার জগৎও প্রসারিত হবে বহুদূর। একটি মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কাল বিধৃত, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একটি বিন্দুতে এসে মিলে যায়। এই মুহূর্তের উপলব্ধি ও বিস্তার, ত্রিস্তরিক এই সময়ের উদ্‌ঘাটন কেবলমাত্র কাব্যনাট্যেরই বিষয় হতে পারে। অর্থাৎ বিষয়ে এবং বিশেষ ছন্দের বিন্যাসে সময়ের সুদূরপ্রসারী দ্যোতনায় কাব্যনাট্য বিশেষ মাত্রা অর্জন করে নিতে পারে। এমনকি কাব্যভাষা শুধু নয়, গদ্যের প্রত্যেক স্পন্দনে কবিতার নিঃশ্বাস জড়িয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'-এর মতো গদ্যনাটকও কাব্যনাট্যের অভিধা পেতে পারে।

বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' মূলত গদ্যভাষায় লেখা হলেও এই নাটক এত বেশি কবিত্বমন্ডিত যে অনায়াসেই কাব্যনাট্যের আলোচনার সীমানায় এসে যেতে পারে। পুরাণের পুনর্জন্মে কবি-কল্পিত 'ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদের সমকালীন।' মূল পুরাণকাহিনির নির্দ্বন্দ্ব গণিকা চরিত্রটির ভাবান্তর প্রথম রবীন্দ্রনাথই লক্ষ করেছিলেন, তারপর বুদ্ধদেব চরিত্রটিকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন। বুদ্ধদেবের তরঙ্গিনী আত্মসংকটে ক্ষতবিক্ষত, নতুন বোধে উত্তীর্ণ এক নারী। অন্যদিকে, যে 'কাম' ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের সাধনাকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল, তাই আবার তাঁকে নতুন এক জীবনের সন্ধান দিল। ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর জীবনে কাম থেকে বিবিধ স্তর-পরম্পরা ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রেমে ও অবশেষে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রমণের মাহাত্ম্যেই দুটি মানুষের আত্ম-আবিষ্কার সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। পুরাণ-কাহিনির অনুসরণ সত্ত্বেও তার মধ্যে নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতার আর্কেটাইপ আবিষ্কার করে কল্পনাসমৃদ্ধ চার অঙ্কে বিভক্ত 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকে কাহিনি চরিত্র ও ঘটনাবর্ণনায় আধুনিক যুগের আধুনিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও তার উত্তরণকে কবি কাব্যময় অভিব্যক্তি দান করেছেন।

সূচনায় গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গীত রচনায় বুদ্ধদেব এলিয়টের Murder in the Cathedral নাটকের কোরাসের গানের দ্বারা যথেষ্ট প্রাণিত হয়েছিলেন। From Ritual to Romance-এর কাহিনির অনুরূপ এই গানও আমাদের এক অনুর্বর পোড়ো জমির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বন্ধ্যাভূমির প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্ন রিক্ত, শূন্য অবস্থানটিকে কবি প্রকাশ করতে চেয়েছেন এইভাবেই।

কাব্যনাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বারাঙ্গনা তরঙ্গিনী নানা কৌশল এবং সুদক্ষ অভিনয়ের দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গের কামস্পৃহার উদ্রেকে তাঁর তপস্বী-সত্তাকে জয় করলেও স্বধর্মচ্যুত হয়ে সে নিজেও পরাজিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বলেছেন, এই একটি ঘটনাতেই নায়ক-নায়িকার 'বিপরীত দিকে পরিবর্তন' ঘটলো, তপস্বীর মনে জেগে উঠলো ইন্দ্রিয়-বাসনা, আর বারাঙ্গনার মধ্যে জেগে উঠলো 'রোমান্টিক প্রেম'। আর এই পারস্পরিক আকর্ষণের নিগূঢ় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দুজনেরই আত্ম-জাগরণ ঘটে গেলো। উভয়ের চোখেই ফুটে উঠলো 'অন্য এক স্বপ্ন', দুজনেই তাদের প্রকৃত স্বরূপ—সেই হারিয়ে ফেলা মুখের খোঁজে উৎকণ্ঠ হল।

তরঙ্গিনীকে প্রথম দেখার পর ঋষ্যশৃঙ্গের যে অভিভব তা অসাধারণ কাব্যময় সংলাপের আধারে অভিব্যক্ত—'সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋক্‌ছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধরে বিশ্বকরুণার বিকিরণ' ...'আমার মনে হচ্ছে, আপনি চিন্ময়, জ্যোতিঃপুঞ্জ, প্রতিভার দিব্যমূর্তি। যে-মনস্বীরা তিমিরের পারে আলোকময়কে

দেখেছিলেন, আপনি যেন তাঁদেরই একজন।' ...

এই উক্তি তরঙ্গিনীর ভিতরকার সংকটকে ঘনীভূত করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'-ও শুনেছিল, ভেবেছিল এই কথা—'আনন্দময়ী মুরতি তুমি/ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার/ছুটে আনন্দ চরণে চুমি।' এই আলোড়িত অনুভবই বুদ্ধদেবের রচনায় প্রসারিত হয়েছে। বন্ধ্যা নগরীতে বৃষ্টি নামার পূর্ব-মুহূর্তে দেহমিলনের বর্ণনা প্রতীকী পাৎপর্যে এবং কাব্যসৌন্দর্যে অতুলনীয় হয়ে উঠেছে—

"জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হলো যারা জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হলো মনোরথ, উচ্ছল হলো নির্ঝর। মেঘ জমলো আকাশে, চমক দিলো বিদ্যুৎ, বিলোল হলো বজ্র। নামলো বৃষ্টি। জাগলো ধ্বনি—প্রতিধ্বনি। প্রাণ থেকে প্রাণে, অঙ্গ থেকে অঙ্গে, তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণায়—প্রতিধ্বনি। ... তুমি আমার তৃষ্ণা, তুমি আমার তৃপ্তি। আমি তোমার তৃষ্ণা, আমি তোমার তৃপ্তি। সর্প তোলে ফণা, ফেনিল হয় সমুদ্র। চলে মন্থন—মন্থন—মন্থন। দীর্ণ মেঘ, তীব্র বেগ। রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ধরণী। বর্ষণ—বর্ষণ—বর্ষণ।"

অনভিজ্ঞ পুরুষের জীবনে কামনার প্রথম শিখা তরঙ্গিনী আর অভিজ্ঞ বারাঙ্গনার জীবনে প্রেমের স্পর্শ ঋষ্যশৃঙ্গ। মিলনের তটভূমিতে দাঁড়িয়ে দুজনের ভাষা তাই পৃথক। আবেগ ব্যঞ্জনার বৈপরীত্যে বাহুমাত্রিক অর্থদ্যোতনায় দুজনের সংলাপ দুলে উঠেছে—

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি নারী।

তরঙ্গিনী। কুমার, আমি তোমার সেবিকা।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি আমি কে। আমি পুরুষ।

তরঙ্গিনী। তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।

তরঙ্গিনী। আমার হৃদয়ে তুমি রত্ন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার শোণিতে তুমি অগ্নি।

তরঙ্গিনী। আমার সুন্দর তুমি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার লুণ্ঠন তুমি।

... ...

তরঙ্গিনী। এসো প্রেমিক, এসো দেবতা—আমাকে উদ্ধার করো।

ঋষ্যশৃঙ্গ। এসো দেহিনী, এসো মোহিনী—আমাকে তৃপ্ত করো

এ সংলাপে ঋষ্যশৃঙ্গের দাহ যেমন তীব্র, তরঙ্গিনীর প্রেম উপলব্ধিও তেমন গাঢ়. ফলে বুদ্ধদেবের ভাষ্যেরই জের টেনে সমালোচক বলেন—"একই ঘটনার ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর এই বিপরীত যাত্রা—একজনের সরলতা থেকে কামে, অন্যজনের কাম থেকে প্রেমে—যেন এক বিন্দুতে দুই বিপরীত শক্তির সঙ্গম, যার আঘাতে নাটকে এল এক দুর্লভ ঘনতা। পাশাপাশি দাঁড়ানো দুই বিপরীতমুখী জেটপ্লেনের মতো কম্পমান

তরঙ্গিনী ও ঋষ্যশৃঙ্গ।" —(দর্পণে দুই মুখ ঃ অমিয় দেব)

তৃতীয় অঙ্কে তরঙ্গিনী ও লোলাপাঙ্গীর গদ্য-সংলাপ কবিতাকে ধারণ করে আছে খুব গভীরে। লোলাপাঙ্গীর কথায় আছে লৌকিক ভয়, উদ্বেগ-ঈর্ষা, অর্থলোভ, আবার মাতৃস্নেহ, কন্যাকে না বোঝার অসহায়তাজাত বেদনা। লোলাপাঙ্গী গদ্যভাষিণী, তার সংলাপে এসবেরই প্রচ্ছায়া. আর তরঙ্গিনীর কথায় অকল্পনীয় আনন্দ ও বেদনার যুগপৎ বিচ্ছুরণ। বাস্তবজীবনের অভিঘাত সত্ত্বেও এ গদ্য মাঝে মাঝেই কাব্যময়। চতুর্থ অঙ্কে দেখি, শান্তার সঙ্গে বৎসরাধিক কাল বিবাহিত জীবনযাপন, যৌবরাজ্যে অভিষেক, রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাস-বৈভব, জনতার জয়ধ্বনি, চাটুকারিতা সত্ত্বেও ঋষ্যশৃঙ্গ নিঃস্ব নিঃসঙ্গ বিষাদখিন্ন—কোন্ এক হারিয়ে যাওয়া মুখের অন্বেষণে রত। নিজের উদ্বেলিত হৃদয় ভাষা পায় এইভাবে—

বিস্বাদ-বিস্বাদ এই রাজপুরী, বিস্বাদ জনতা, আমার মন্ত্রপূত বিবাহ বিস্বাদ,
বিবর্ণ দিন, তিক্ত কাম, উৎপীড়িত রাত্রি।
আমি যেন পিঞ্জরিত জন্তু, জীবনের বলাৎকারে বন্দী।
ওরা জানে না, কেউ জানে না—আমি দেখি অন্য এক স্বপ্ন।

কিংবা নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে আমি ব্যাপ্ত,
তরঙ্গ থেকে তরঙ্গে আমি চঞ্চল—
তার আলিঙ্গনে লুপ্ত হয়ে, তার বৈভবের অন্তরালে।
সে কোথায়? সে কে? তার নাম পর্যন্ত জানি না।

অথচ একবারও কি মনে হয় না, রাজর্ষির তরঙ্গ ...' উক্তির মধ্যে তাঁর অজ্ঞাতসারেই তরঙ্গিনীর নাম উচ্চারিত হলো! বাইরে ঋষ্যশৃঙ্গের জীবনে বৈভব-বৈদগ্ধ, অন্তরে তার অসহায়তা; বাইরে সকলের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের অন্তরে তিনি একাকী হয়ে গেছেন। অংশুমানের সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর এই মনোভাব গদ্যসংলাপের দ্বৈততায় ধরা পড়েছে।

অংশুমান। আমি সত্যবাদী। আপনাকে একটি মর্মান্তিক কথা বলতে এসেছি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। মর্মান্তিক? তা হলে নির্ভয়ে বলুন। আমি এক বৎসর যাবৎ স্তুতি শুনেছি—শুধু স্তুতি, জয়ধ্বনি, অভিনন্দন। এই ঘৃতান্ন-ভোজে আমার অগ্নি-মান্দ্য হয়েছে। আপনি তা প্রশমিত করুন।

অংশমান। অভিনন্দনে আপনার কোনো অধিকার নেই।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার দুর্ভাগ্য—আপনি ছাড়া কেউ তা বোঝে না।

কথার কৌশলে গদ্য সংলাপে এখানে বক্রোক্তির মাত্রা এসে লাগে। গদ্যধর্মী উক্তি-প্রত্যুক্তির সংঘাত-সমন্বয়ের মধ্যেই কবিতা তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। বহুকথিত কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্বকে শান্তিময় সহাস্তানে চিহ্নিত করে কবি যেন দেখাতে চাইলেন, কাম ও প্রেমের মধ্যে কোথাও কোনো বিরোধ নেই, বরং একে অপরের পরিপূরক, তা মানুষকে আত্ম-অন্বেষণে প্রবুদ্ধ করেছে।

এই নাটকে আগাগোড়া গদ্যের ন্যায়সম্মত ধরনকে বজায় রেখেও বুদ্ধদেবের ভাষা গূঢ় উপলব্ধির জগতে

কবিতার ব্যঞ্জনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। গদ্যভাষায় কবিতার শব্দবন্ধ ও অলংকার সৃজনে, পঙ্‌ক্তি বিন্যাসের অসমমাত্রিক পদ্ধতিতে। অত্যুক্তি ও বক্রোক্তির অলংকরণে, তৎসম ও চলিত শব্দের স্বচ্ছন্দ মিলন-সাধনে, শব্দের বিস্ময়কর শৃঙ্খলা ও সংযম রক্ষায়, নাটকীয় গতি আনার জন্যে প্রয়োজনবোধে কথ্যভাষার মধ্যে থেকে ক্রিয়াপদ ও শব্দ আমদানি ও শব্দ আমদানি করে বুদ্ধদেব এমনই কাব্যবিভা সঞ্চার করেছেন যা—'reflects the speed of life, the pressure of life, its very essence'. এইভাবেই সার্থক কাব্যনাট্যের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে তপস্বী ও তরঙ্গিনী।

৬.৬ চরিত্রায়ণ

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকে মুখ্য চরিত্র এই দুজন, তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ এবং 'বারাঙ্গনা' তরঙ্গিনী। কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং তারপর পুণ্যের পথে তাদের নিষ্ক্রমণে আরো যারা নানা পর্যায়ে সাহায্যকরেছে, তারা হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ-জনক বিভাণ্ডক, ঋষ্যশৃঙ্গ পত্নী শান্তা, তরঙ্গিনীর জননী লোলাপাঙ্গী এবং দুই প্রণয়ী যুবক—অংশুমান ও চন্দ্রকেতু, যথাক্রমে শান্তা ও তরঙ্গিনীর প্রণয়প্রার্থী। রাজমন্ত্রী এবং রাজপুরোহিতও অবশ্য আছেন, আছে তরঙ্গিনীর সখীরা, গাঁয়ের মেয়েরা, রাজদূত এবং ঘোষক। তবে তরঙ্গিনীর সখীদের যেমন কোনো সংলাপ নেই, তেমনই 'ঘোষক' একটি চরিত্র মাত্র। রাজদূত কিংবা ঘোষক কর্তব্য পালন করেছে, নাটকে তাযপর্য পায়নি। আমরা ঋষ্যশৃঙ্গ এবং তরঙ্গিনী চরিত্র এবং শান্তা-অংশুমানের কাহিনিবৃত্ত থেকেই তাদের চরিত্র আলোচনা করতে পারি।

ঋষ্যশৃঙ্গ

পুরাণ-কথিত এই ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রে আধুনিক মানসের সংকট ও যন্ত্রণা সঞ্চার করে বুদ্ধদেব বসু চরিত্রটিকে একটা বিস্তৃতি দিয়েছেন। আলোচ্য নাটকে আমরা দেখি, জীবনের কয়েকটি পর্যায় অতিক্রমণে ঋষ্যশৃঙ্গ বহুমাত্রিক একটি চরিত্র হয়ে উঠেছেন। প্রথম পর্বে বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ অপাপবিদ্ধ, শুদ্ধাচারী, তাপস। দ্বিতীয় স্তরে দেখি, প্রথম 'নারী' সংসর্গে জেগেছে তাঁর এযাবৎ প্রসুপ্ত পৌরুষ, রূপাজীবার শরীরী স্পর্শ তাঁর মধ্যে অনাস্বাদিত অ-পূর্ব এক অনুভূতিকে জাগিয়ে দিয়েছে, যাকে বলতেই পারি 'কাম'। তৃতীয় পর্বে আমরা দেখি 'বিবাহিত' এবং রাজ-জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে—ক্লান্ত, বিবর্ণ, নাগরিক এবং এই সময়েই সেই 'প্রথম' নারীর মুখ খুঁজে পেতে চাইছেন, ফিরে পেতে উৎসুক। চতুর্থ এবং শেষ পর্বে লক্ষ করি, আত্ম-স্বরূপ 'আবিষ্কার' ও যথার্থ আত্ম-অনুসন্ধানের তাড়নায় ঋষ্যশৃঙ্গের মহানিষ্ক্রমণ-পুণ্যের পথে, সেখানে আকাঙ্ক্ষিতা সেই 'প্রথমা'কেও পিছনে ফেলে যান তিনি।

পুরাণে ঋষ্যশৃঙ্গকে 'নারী'-অভিজ্ঞতা বা যৌন-অভিজ্ঞতার বাইরে রাখা হয়েছে। এর যৌক্তিকতা যাই হোক নারী সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতায় একটা অভিনবত্ব আছে এটুকু স্বীকার্য। এই অজ্ঞতা যেমন কখনো সুন্দর তেমনই কখনো তো অভিশাপ হয়েও উঠতে পারে। ঋষ্যশৃঙ্গের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছিল, নারী কি—তা না জানার ফলেই পিতার নিষেধের গণ্ডি তিনি যে অতিক্রম করেছিলেন তা তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভবই হয়নি। সেই

অজ্ঞতা থেকেই অসংকোচে তিনি পিতার কাছে বিবৃত করেন তাঁর প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা—

'তিনি এক আশ্চর্য ব্রহ্মচারী। দীর্ঘকায় নন, খর্বকায়, নন, দেবতার মতো কান্তিমান। কনকতুল্য তাঁর বর্ণ, দেহ সুঠাম ও সংকেতময়; তাঁর মস্তকে নীল নির্মল সংহত জটাভার। শঙ্খের মতো গ্রীবা, দুই কর্ণ যেন উজ্জ্বল কমণ্ডলু। নয়ন তাঁর আয়ত ও স্নিগ্ধ; আনন যেন উদ্ভাসিত ঊষা; বালার্কের মতো অরুণবর্ণ তাঁর কপোল। তাঁর বাহু, বক্ষ ও পদযুগ নির্লোম; বক্ষে দুটি মাংসপিন্ড মনোহর নৈবেদ্যের মতো বর্তুল। ...'' সেই দেবতুল্য ব্রহ্মচারীকে দেখে ঋষ্যশৃঙ্গ অভিভূত, যে অনঙ্গব্রতে তরঙ্গিনী অঙ্গীকৃত, তার পণ আত্মদান, মন্ত্র রতি, যজ্ঞ প্রীতি, ধ্যান আনন্দযোগ, দ্বৈতবাদী সে। ঋষ্যশৃঙ্গ সেই অনুভূতির স্মৃতিচারণ করে বিভান্ডকের কাছে—

''সেই আলোকলক্ষণ ব্রহ্মচারী আমাকে আলিঙ্গান করলেন—যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গান করে লতা। ... তাঁর ... অধরের সঙ্গে অধরের সংযোগে চুম্বন করলেন আমাকে—যেমন পুষ্পকে চুম্বন করে ভৃঙ্গ। আমার দেহে জাগলো অজ্ঞাতপূর্ব পুলক, আমার সত্তায় সঞ্চারিত হলো অমৃতস্পর্শ।''

সেই ''ব্রহ্মচারী'র অদর্শনে ঋষ্যশৃঙ্গ খিন্ন, ব্যাকুল। সে যে 'নারী' একথা জেনে তার প্রশ্ন—'নারী? পিতা, নারী কাকে বলে? তারপর ঋষ্যশৃঙ্গের মোহমুগ্ধ উচ্চারণ—'নারী। ... নারী। ... নারী। নুতন নাম, নুতন রূপ, নূতন ভাষা। নূতন এক জগৎ। ... মোহিনী, মায়াবিনী, উর্বশী। নূতন জপমন্ত্র আমার। ... তুমি নারী, আমি পুরুষ। ...'

অস্নাত অভুক্ত অনিদ্র থাকতে চেয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গ, সেই নারীর অঙ্গস্পর্শ, চুম্বনের অনুভূতি যাতে লুপ্ত না হয়ে যায়। পিতার নির্দেশ ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করে তপস্যার, কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের এই অস্থির আর্ত সময়েই আবার এগিয়ে এল সেই নারী—তখন অনেক পিছনে পড়ে রইল পিতার সতর্কবাণী। একবার যিনি জেনেছেন, পেয়েছেন অনঙ্গব্রতের অধিকার; তখন আর ফেরবার পথ রইল না।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি নারী।

তরঙ্গিনী। কুমার, আমি তোমার সেবিকা।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি আমি কে। আমি পুরুষ।

তরঙ্গিনী। তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।

তরঙ্গিনী। আমার সুন্দর তুমি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার লুণ্ঠন তুমি।

তরঙ্গিনী। বলো, তুমি চিরকাল আমার থাকবে।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি তোমাকে চাই—তুমি প্রয়োজন!

উভয়ের সংলাপে মনোযোগ দিলে দেখি কি অসাধারণ বিপ্রতীপতায় চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে উভয়ের মানসলোক। বারাঙ্গনার কাছে এই এক পুরুষ 'ঈশ্বর', আর তপস্বীর কাছে এই এক নারী 'বাসনা'। কাম থেকে

প্রেমের মহতী ভুবনে ঊর্ধ্বায়ত হয়ে যাচ্ছে তরঙ্গিনী বলেছে—'বলো, তুমি চিরকাল আমার থাকবে!' আর ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে নারী হয়ে উঠছে 'প্রয়োজন'। তরঙ্গিনী কামনার আবর্ত থেকে অব্যাহতি চেয়ে বলেছে—'এসো প্রেমিক, এসো দেবতা—আমাকে উদ্ধার করো।' আর সারল্যের স্বর্গ থেকে নির্বাসন চেয়ে কামনার তীব্র আশ্লেষে আবিষ্ট ঋষ্যশৃঙ্গের আর্তি—'এসো দেহিনী, এসো মোহিনী—আমাকে তৃপ্ত করো।' বুদ্ধদেব এইজন্যই বলেছিলেন, এখানে "নায়ক-নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিনীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয়লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হলো 'পতন' আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোমান্টিক প্রেম'—"

তরঙ্গিনীর সঙ্গে নগরে প্রবেশ করেন ঋষ্যশৃঙ্গ, কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি নামে, জনপদবাসীর সমবেত উল্লাসের মধ্যেই 'রাজকীয় চক্রান্তে' তরঙ্গিনীর সঙ্গচ্যুত হন ঋষি, ঋষ্যশৃঙ্গ এক অর্থে তখন 'রাজবন্দী'। বলা বাহুল্য, একদিন স্বেচ্ছায় যে ব্রতপালনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তরঙ্গিনী, তা' পালন করা ছাড়া তারও আর কোন উপায় ছিল না। তারপর তৃতীয় অঙ্গ জুড়ে রয়েছে তরঙ্গিনীর বিরহব্যাকুলতার ছবি। ঘোষকের কাছ থেকে তরঙ্গিনীর মতো আমরাও জানতে পারি, আগামী শুভলগ্নে রাজা লোমপাদ তাঁর জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। চতুর্থ অঙ্গে আমরা আবার দেখি ঋষ্যশৃঙ্গকে—প্রথম মিলনের স্মৃতিতে আতুর, বর্তমান জীবনের সংস্কারে বিদ্ধ, ভবিষ্যতের জন্য উৎসুক ঋষ্যশৃঙ্গকে।

মধ্যবর্তী এই একটা বছর ঋষ্যশৃঙ্গের সাক্ষাৎ আমরা পাইনি। এখন তাঁকে আমরা দেখি ক্লান্ত, বিমুখচিত্ত, শান্তার সঙ্গে তাঁর বিবাহিত জীবনের একবছর অতিক্রান্ত, অথচ কোনো এক গূঢ় যন্ত্রণায় ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠেছে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে তার 'রাজকীয়' জীবন, প্রজাদের প্রণামেও তিনি উদাসীন—

বিস্বাদ—বিস্বাদ এই রাজপুরী, বিস্বাদ জনতা, আমার মন্ত্রপূত বিবাহ বিস্বাদ,

বিবর্ণ দিন, তিক্ত কাম, উৎপীড়িত রাত্রি।

আমি যেন পিঞ্জরিত জন্তু, জীবনের বলাৎকালে বন্দী।

(লক্ষ করি, তপস্বীর ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ—'জীবনের বলাৎকারে বন্দী।')

একই সময়ে লেখা 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'-এ ঋষ্যশৃঙ্গের জবানীতে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন—

"আমার কাছে রাজপুরী বিস্বাদ, বিস্বাদ আমার পরিণীতা রাজকন্যা, বিবর্ণ দিন, প্রেমহীন, তিক্তকাম রাত্রি। তিক্ত আমার মন্ত্রপুত মিলন, উৎপীড়িত আমার বীজস্রোত যার তেজে বৃষ্টি নামে, ফসল ফলে, যে দেশে আমি হর্ষধারা নামিয়েছি একা আমি শুকনো।"

শান্তার নৈঃসঙ্গ্য তার গানে আর ঋষ্যশৃঙ্গের নৈরাশ্য তার সংলাপে পরপর এখানে ধরা পড়েছে। শান্তার সঙ্গে কথোপকথনে আমরা দেখি 'অন্য' এক ঋষ্যশৃঙ্গকে যাঁর 'জিহ্বা মসৃণ' 'শব্দকোষ বিশাল'; সুতরাং রাজোচিত 'বাক্যপ্রয়োগ' বা শ্রবণে তাঁর যুগপৎ অনীহা অপ্রকাশ্য রাখার কৌশল করায়ত্ত, কেননা 'যেখানে বক্তব্য কিছু নেই, সেখানে বাক্যে কী এসে যায়?' নাগরিক বাক্‌চাতুর্য তখন তাঁর অধিগত।

এই সময় বিভাণ্ডকের আগমনে এবং পুত্রকে তাঁর ভর্ৎসনায় ঋষ্যশৃঙ্গের অন্তরের শূন্যতা যেন আরো বেশি করে ফুটে ওঠে। বিভাণ্ডকে বলেন যে, ঋষ্যশৃঙ্গ আজ ভ্রষ্ট, স্খলিত—'এত্ত কি সম্ভব যে এই রাজপুরী-

নগর-এই বিস্তীর্ণ কামরশ্মি—এই উজ্জ্বল কালান্তক উণাজাল—তুমি এরই মধ্যে মক্ষিকার মতো বন্দী হয়ে থাকবে—তুমি, ঋষ্যশৃঙ্গ?' পিতার এই ধিক্কার ঋষ্যশৃঙ্গকে সচেতন করে, উন্মুখ করে তোলে কোনো এক অনির্দেশ্য অথচ ধ্রুব লক্ষ্যের প্রতি। ঋষ্যশৃঙ্গ, পরিবর্তিত ঋষ্যশৃঙ্গ পিতাকেও বিরূপবচনে বিদ্ধ করেছে, কিন্তু পিতৃআজ্ঞা পালন করে নি। কেননা ঋষ্যশৃঙ্গ তখন অপেক্ষমান—

'আমারও কিছু প্রয়োজন আছে, ... আমি চাই—... কী চাই, জানি না ... কিন্তু এখানেই আমার অপেক্ষা—তোমার জন্য, তোমার জন্য।'

বস্তুত, তরঙ্গিনী একদিন তাঁর মধ্যে যে জাগরণ ঘটিয়েছিল তারই আলোকে এবার নিজের অস্তিত্বকে খুঁজতে চাইছেন ঋষ্যশৃঙ্গ। কেননা "আর সকলে তাকে এক একটা খোপে বন্দী করতে চেয়েছে—কেননা ছোটো কোনটা বা বড়ো, দিতে চেয়েছে এক একটা সংজ্ঞার্থে ভূমিকা—ত্রাতা, অন্নদাতা, যুবরাজ, মহাত্মা, কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। একমাত্র তরঙ্গিনীর কাছে সে জানতে পেরেছে তার অবিকলত্ব।"—(আধুনিক জীবন ও পুরাণ ছায়া, 'প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ'/সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়) এই বিপন্নতার কথা, যন্ত্রণার কথা সর্বসমক্ষে স্বীকারও করেছেন ঋষ্যশৃঙ্গ, তরঙ্গিনীও স্পন্দিতবক্ষে শুনেছে তার পক্ষে গৌরবময় এই স্বীকারোক্তি। ঋষ্যশৃঙ্গ বলেছেন—"শোনো—আমি সকলের সামনে বলছি, এই যুবতী আমার ঈপ্সিতা। এই অঙ্গদেশ—যেখানে আমি হর্ষধারা নামিয়েছি, আমি সেখানে শুষ্ক ছিলাম। দগ্ধ ছিলাম তারই বিরহে, তোমরা যাকে তরঙ্গিনী বলো। আমি জানতাম না কাকে বলে নারী। আমি যে পুরুষ তাও জানতাম না। সে আমাকে জানিয়েছিলো। আমি তাই কৃতজ্ঞ তার কাছে। সে আমার পরিত্যাজা নয়, সে আমার—অন্তরঙ্গা। তার কাছে—অঙ্গদেশে একমাত্র তার কাছে—আমি ত্রাতা নই, অন্নদাতা নই, যুবরাজ নই, মহাত্মা নই—একমাত্র তারই কাছে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নই আমি। একমাত্র তারই কাছে আমি অনাবিলভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ। অতএব আমি তাকে আমার অধিকারিণারূপে স্বীকার করি।'

এইখানেই হয়তো ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রের সবচেয়ে জটিলতম ব্যাসকূট স্পর্শ করেছেন নাট্যকার। তরঙ্গিনী ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে বিপন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছে—

'তোমার দৃষ্টি আজ অন্যরূপ কেন? ... কেন তোমার চোখের কোলে ক্লান্তি? ... ঋষ্যশৃঙ্গ, তোমার চোখের আলোয় আবার আমি নিজেকে দেখতে চাই। ... কিন্তু কোথায় তুমি? তুমি কেন হারিয়ে যাচ্ছো? তোমার চোখের সেই দৃষ্টি আর কি ফিরে আসবে না? ...'

তরঙ্গিনীর এই কথাতেই ঋষ্যশৃঙ্গের আত্ম-দর্শনের সূচনা—সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বলেন—'আমি ঘুমন্ত ছিলাম, সে আমাকে জাগিয়েছিলো। আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ছিলাম, আবার আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলো সে।'

তরঙ্গিনীই তার বন্ধন, তরঙ্গিনীই তার মুক্তি, তার সর্বস্ব। তরঙ্গিনীর প্রশ্ন তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ করেছে ঋষ্যশৃঙ্গকে। 'তুমি কেন হারিয়ে যাচ্ছো?' সত্যই, আমরা তো দেখছি 'এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ বাইরের দিক থেকে অনেক বদলে গিয়েছেন, শিখেছেন রাজপুরোহিত বৈদগ্ধ ও কপটতা, বেঁকিয়েও

ব্যঙ্গের সুরে কথা বলতে শিখেছেন', অথচ তাঁর যে সহজাত শুদ্ধতা তখনো অস্পৃষ্ট, তারই জন্য এযাবৎ যাপিত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে তপস্বীকে রাজগৃহ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়তে হবে। আত্ম-সংশোধন নয়, আত্ম নির্মাণ তাঁর উদ্দেশ্য। তাই তরঙ্গিনীর আহ্বানেও ঋষ্যশৃঙ্গের প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব নয়।

'হয়তো আমার সমিধকাষ্ঠে আর প্রয়োজন হবে না। অগ্নিহোত্রে আর প্রয়োজন হবে না। মেধা নয়, শাস্ত্রপাঠ নয়, অনুষ্ঠান নয়—আমাকে হতে হবে রিক্ত, ডুবতে হবে শূন্যতায়।'

এই অভিভব থেকেই তপস্বী-বেশী ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিনীকেও চিহ্নিত করে দেন তার পথ। রাজগৃহে নয় আশ্রমে নয়, হারিয়ে যাওয়া 'মুখ' খুঁজতে ঋষ্যশৃঙ্গ তখন এক অজানা পথের পথিক। তরঙ্গিনীকে উদ্দেশ্য করে এ তো তাঁর নিজেরই স্বগত উচ্চারণ—'কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে তরঙ্গিনী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হয়ে গিয়েছি। আমাকে সব নূতন করে ফিরেপেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানি না, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। যার সন্ধানে তুমি এখানে এসেছিলে, হয়তো তা আমারও সন্ধান। কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, তরঙ্গিনী।'

তারপর কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ বলেন, 'হয়তো জন্মান্তরে আবার দেখা হবে'। অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর বৃত্ত কোথাও অপেক্ষা করে থাকবে। এখানেই, এই অতৃপ্তি আর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পুরাণ-কথা আধুনিক মানসের দ্বন্দ্ব-সংকটে অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। তরঙ্গিনীকে এই প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে তপস্বী ও তরঙ্গিনী দুজনেই উপলব্ধি করেন কোথায় প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি—নিজেকে খুঁজে পাবার জন্য তাই যাত্রা শুরু হয় আবার, এত বাসনা এত সাধনা কোথায় গিয়ে মেশে, পথের শেষে কী আছে সেটাই তখন অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে।

তরঙ্গিনী

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-র সব কয়টি দৃশ্যে যার উপস্থিতি, যার জয়ের আনন্দ, যার হারাবার বেদনা, আত্ম-স্বরূপের সন্ধানে যার অভিযাত্রা আগাগোড়া নাটকটিকে উদ্বেল করে রেখেছে, সে তরঙ্গিনী—বারাঙ্গনা হিসেবে যার নাটকে 'আবির্ভাব', প্রেমিকা হিসেবে উত্তরণ এবং শেষপর্যন্ত তপস্বিনী রূপে তার পরিণতি। পুরাণবৃত্তে কোথাও তার নাম ছিল না, ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যভঙ্গ করেছিল এক গণিকা, এইমাত্র। কার্যসিদ্ধির পর তাকে আর কোথাও দেখা যায়নি। সেই 'পতিতা' রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অন্যতর মহত্তর এক মাত্রা পেয়েছিল। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের দ্বারা ভাবিত হলেও তিনি আরো একটু যেন এগিয়ে গেলেন, 'পতিতা'-র শ্রেণিপরিচয় থেকে তাকে উদ্ধার করে বিশেষ নাম দিলেন—'তরঙ্গিনী'! ঋষ্যশৃঙ্গকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী-বলয় নির্মিত হয়, একটা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে সেখানে তরঙ্গিনী।

রাজা লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টিজনিত হাহাকার নিরাকরণের জন্য রাজপুরোহিত ও রাজমন্ত্রীর পরামর্শে তরুণ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য-নাশের জন্য নির্বাচিত তরঙ্গিনী—চম্পানগরীর গণিকাশ্রেষ্ঠা, তার জননী

লোলাপাঙ্গীর শিক্ষায় লাস্যময়ী নায়িকা, মোহিনী, কলাবতী, ছলনানিপুণ। রাজপুরোহিত বলেছেন—"এইমাত্র নগরপাল আমাকে জানালেন যে চম্পা নগরের গণিকাদের মধ্যমণি এখন তরঙ্গিনী। রূপে লাস্যে ছলনায় তার নাকি তুলনা নেই। আবাল্য তার মাতারই ছাত্রী, সর্বকলায় বিদগ্ধ। শোনা যায়, লোলাপাঙ্গীর কাছে শিক্ষা পেলে বিকৃত দংষ্ট্রা কুরূপাও বৃদ্ধের ধনক্ষয় ঘটাতে পারে, আর তরঙ্গিনী স্বভাবতই মোহিনী।"

বহুর পরিচর্যায় যে অভ্যস্ত, বিশেষের প্রতি পক্ষপাতহীন এই নারীই পারবে ঋষিকে বিহ্বল করতে, তাই প্রিয়া নয়, জায়া নয়; একান্তই মোহিনী রমণী তরঙ্গিনী এইভাবেই রাজকীয় ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ে। সেদিন অনেক গর্ব করেই বোধ হয় তরঙ্গিনী বলেছিল—'আমার ধর্ম বহুর পরিচর্যা। ... যে আমাকে মূল্য দেয় তারই জন্য আমি অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখি—শূদ্র, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, যুবা, রূপবান, কুৎসিত আমার কাছে সকলেই সমান।' কিন্তু সেদিন বিধাতা বোধ হয় অলক্ষে হেসেছিলেন। তাই তপস্বীকে 'পরিচর্যা'র পর তরঙ্গিনীরি সব হিসেব বদলে গেল। অপাপবিদ্ধ তরুণ জানতেন না কাকে বলে নারী, কাকেই বা বলে পুরুষ। তরঙ্গিনী তাঁকে জানালো আর আশ্চর্যজনকভাবে একইসঙ্গে তিনি নিজেও জানলেনসে কে বা সে কি। ঋষিই জানালেন তাকে, তার গণিকা-বৃত্তির গাঢ় অভ্যন্তরে ক্ষীণপ্রাণ দীপশিখা অকস্মাৎ উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠলো। 'পতিতা'র ঋষিকুমার বলেছিলেন—

'কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা
তোমার পরশ, অমৃত সরস
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।'

কিংবা 'কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে
আনন্দময়ী মুরতি তুমি
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।'

বুদ্ধদেবের ঋষিকুমার বললেন—

'আপনি কি কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা? কী দীপ্ত আপনার তপোপ্রভা, কী স্নিগ্ধ আপনার দৃষ্টিপাত, আপনার ভাষণ কী লাবণ্যঘন। আপনাকে দেখে আমি দুর্লভ চিত্তপ্রসাদ অনুভব করছি। ...

আমার মনে হচ্ছে, আপনি চিন্ময় জ্যোতিঃপুঞ্জ, প্রতিভার দিব্যমূর্তি। ...সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধুম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋক্‌ছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ াপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধারে বিশ্বকরুণার বিকিরণ।"

এই 'অভিবাদন' আশিরনখ আলোড়িত করল তরঙ্গিনীকে। এতদিন সে অনেক পুরুষের প্রশংসা শুনেছে। কিন্তু এই 'স্তব' শোনেনি কোনোদিন। এতদিন পরে তরঙ্গিনী আরেকভাবে চাইলো নিজের দিকে—সে শুধু

কামনার ধন নয়, আরাধনার লক্ষ্য। প্রথমে ঋষির বন্দনাকে তির্যক ব্যঙ্গে প্রতিহত করেছিল তরঙ্গিনী—'সত্যি কি তিনি ভাবছেন আমি মুনি, বা ছদ্মবেশে দেবতা? (মৃদুস্বরে হেসে ওঠে) বালক, বালক। কখনো কোনো নারী দ্যাখেন নি কখনো কোনো যুবাও দ্যাখেন নি।' কিন্তু ভিতরে ভিতরে "মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মেই ভূমিক্ষয় হচ্ছিল তরঙ্গিনীর সচেতন ছলনার নীরন্ধ্র প্রাচীরে।" ঋষির অবোধ প্রশংসায় যথার্থই মুগ্ধ হয়েছিল এই মোহিনী নারী। ঋষ্যশৃঙ্গও তার কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন অনিন্দ্যসুন্দর এক পুরুষরূপে "কিন্তু এই বনে কি সরোবর নেই? কোনো ভাদ্রের নির্বাত অপরাহ্নে, কোনো সরোবরের স্থির স্বচ্ছ জলে তিনি কি নিজেকেও দেখেননি কখনো? 'সুন্দর তোমার আনন, তোমার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল'। কে কাকে বলছে!"

মুনির এই একটি কথাতেই তরঙ্গিনীর এই জনমেই জন্মান্তর ঘটে গেল। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে আমরা দেখলাম এক 'নূতন' তরঙ্গিনীকে—নাট্যকার যথার্থই বলছেন—"দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিনীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয় লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হলো পতন আর বারাঙ্গানাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোমান্টিক প্রেম'—" এই 'বিপরীত দিকে পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত উভয়ের সংলাপে। ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে নারী তখন 'ক্ষুধা-ভক্ষ্য-বাসনা' 'শোণিতে অগ্নি' 'প্রয়োজন'; আর তরঙ্গিনী বলে—

'কুমার, আমি তোমার সেবিকা।

... তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

... আমার হৃদয়ে তুমি রত্ন।

... আমার সুন্দর তুমি।

... বলো চিরকাল তুমি আমার থাকবে!

তপস্বীকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে চায় তরঙ্গিনী, যেখানে তার 'ঈশ্বর'কে 'বুকের মধ্যে লুকিয়ে' রাখতে পারবে। তার গভীর আকুলতা তখন—

এসো প্রেমিক, এসো দেবতা—আমাকে উদ্ধার করো।

—তপস্বীর সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা রণিত হয় তারপরই—

এসো দেহিনী, এসো মোহিনী—আমাকে তৃপ্ত করো।

আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয় উন্মুখ এই দু'জন। তারপর নাট্য—পরামর্শে আমরা দেখি বৃষ্টিমুখর পরিবেশে জনতার সমবেত উল্লাসের মধ্যে তরঙ্গিনী ও তার সখীদের দ্বারা পরিবৃত ঋষ্যশৃঙ্গ চম্পানগরে প্রবেশ করবেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে তৃতীয় অঙ্কের ব্যবধান এক বছরের, তরঙ্গিনীর ভাবান্তরের জন্য এই কালগত ব্যবধানটুকু দেখানো প্রয়োজন ছিল। কেননা, ঋষ্যশৃঙ্গকে 'জয়' করে নগরে আনার 'চক্রান্তে' একসময় তরঙ্গিনীই ছিল অংশীদার। কিন্তু যে তরঙ্গিনী তার 'প্রেমিক' ঋষ্যশৃঙ্গকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল সে অন্য

জন, তবু তাকেই ঋষ্যশৃঙ্গকে সমর্পণ করতে হলো রাজকীয় চক্রান্তে। কেননা সেই মুহূর্তে এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তার। তারপর তরঙ্গিনীর আত্মসংকট ও আত্ম-দর্শনের সূচনা।

ঘোষকের ঘোষণায় তরঙ্গিনীর অস্ফুট অথচ তীব্র স্বগতোক্তি—'লোমপাদের জামাতা। যুবরাজ'! রাজ্যে অর্ধমাসব্যাপী উৎসব, প্রজারা উৎফুল্ল, আনন্দিত। শুধু নিরানন্দ তরঙ্গিনী, অংশুমান-চন্দ্রকেতু। ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী নানাভাবে এদের সুখের অন্তরায় হয়েছে। যাই হোক, লোলাপাঙ্গী কন্যাকে বলেছে—'তুই ঋষ্যশৃঙ্গকে জয় করেছিলি, ... আর সেইজন্যই তো এই সৌভাগ্য আজ সারা দেশের। তোরই জন্য।' কিন্তু তরঙ্গিনী যেন এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করেছে সেই সত্য—'... আমি কেউ নই। শুধু যন্ত্র, শুধু উপায়।' কিন্তু শুধু যন্ত্র হয়ে থাকতে চাইবে কেন এই নবজাগ্রত অনুভব! তাই নিজেকে খুঁজে পেতে শুরু হয় তারই নিজস্ব জগতে এক পরিক্রমা। একবার জননীকে বলেছে—'আমার যেন মনে হয় তোমার মুখের তলায় অন্যমুখ লুকিয়ে আছে। আমার পিতা তা-ই দেখেছিলেন।' আরেকবার প্রণয়প্রার্থী চন্দ্রকেতুকে বলেছে—'সত্যি বলো—আমি রূপবতী? ... দ্যাখো—নিবিড় চোখে তাকিয়ে দ্যাখো আমার দিকে। আমার মনে হয় আমার মুখের তলায় অন্য এক মুখ লুকিয়ে আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো? ... আমার মনে হয় আমার অন্য এক মুখ ছিলো—আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। আমি খুঁজি—আমি খুঁজি সেই মুখ। তুমি তা ফিরিয়ে দিতে পারো?...'

বস্তুত তরঙ্গিনী ফিরে পেতে চাইছে তার একবছর আগের অভিজ্ঞতা। ঋষ্যশৃঙ্গ তাকে যে ভাষায় অভিবাদন করেছিলেন সেই ভাষাতে সঞ্জীবিত হতে চাইছে সে। কিন্তু কাব্য-পড়া চন্দ্রকেতুর সাধ্য কী তাকে সেই ভাষায় নন্দিত করে! কিন্তু সেই অলঙ্কারিক ভাষা বহুব্যবহৃত হতে হতে জীর্ণ হয়ে গেছে তরঙ্গিনীর কাছে। এখন তার কাঙ্ক্ষিত আনন্দ—"... আমি চাই আনন্দ—প্রতি মুহূর্তে আনন্দ। আমি চাই রোমাঞ্চ—প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ। আমি চাই সেই দৃষ্টি, যার আলোয় আমি নিজেকে দেখতে পাবো। দেখতে পাবো আমার অন্যমুখ, যা কেউ দ্যাখেনি, অন্য কেউ দ্যাখেনি। ..."

এইসব ভাবনায় নিজের বৃত্তি থেকে সরে এসেছে তরঙ্গিনী, বহুর পরিচর্যা এখন আর তার ব্রত নয়। লোলাপাঙ্গীর বৈষয়িক বুদ্ধি তাতে আহত হয়, চন্দ্রকেতু যে-কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে। লোলাপাঙ্গী তাকে বোঝায়, ভয়ও দেখায়, কিন্তু তার কন্যা আজ অন্য গ্রহের যেন অধিবাসী। সে বলে—"তুই পারিস জ্যোতির্ময়ী সতী হতে, কিংবা হতে পারিস বারমুখীদের মুকুটমণি। অন্য কোন পথ নেই তোর।" কিন্তু এই সব হিসেবের বাইরে, চেনা পথের বাইরে 'অন্য কোনো পথে'ই যাত্রা শুরু তরঙ্গিনীর।

তাই তার মোহিনী বেশভূষা, দর্পণকে তার জিজ্ঞাসা।

'দর্পণ, বল, সে কি আমার চেয়েও রূপসী? সে কি দীর্ঘাঙ্গী আমার চেয়ে? আরো তন্বী? তার অধর আরো রক্তিম? বক্ষ আরো সুগন্ধি? তার বাহুতে কি আরো বিশাল অভ্যর্থনা? ...'

এইপর্বে স্তরে স্তরে উন্মোচিত হয়েছে তরঙ্গিনীর অস্থির মনের জটিল গ্রন্থি।

তুমি কি আমাকেই দেখেছিলে? এই আমাকে? ... আর কেন দৃষ্টিপাত করো না? ... আমি স্বপ্নে দেখি

তোমার দৃষ্টি—জাগরণে দেখি তোমার দৃষ্টি। কিন্তু তুমি যা দেখেছিলে তা আমি দেখি না কেন? ...'

কখনো রাজকুমারী শান্তার প্রতি ঈর্ষায়, কখনো ঋষিপুত্রের জন্য লজ্জায়, কখনো গর্বে কখনো যন্ত্রণায় তরঙ্গিনীর এই স্বাভিজ্ঞান খুঁজে ফেরা। কখনো আত্মধিক্কারে জর্জরিত করে নিজেকে—

'আমি তোমাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবো।' পাপিষ্ঠা, কপটভাষিণী, পারলি কই? অন্যের হাতে অর্পণ করলি, সঁপে দিলি শান্তার বাহুবন্ধে। ... যন্ত্রণাময় তার উচ্চারণ—'প্রিয়, আমার প্রিয়, আমার প্রিয়তম, কেন আমি তোমাকে নিয়ে চলে যাইনি—দূরে, বহু দূরে—যেখানে শান্তা নেই, লোলাপাঙ্গী নেই, চন্দ্রকেতু নেই—যেখানে তোমার নামে কেউ জয়কার দেয় না?" ...

এইসব বিপরীতমুখী ভাবনার মধ্যে থেকেই জন্ম নিতে থাকে আর এক তরঙ্গিনী—স্থির ঋদ্ধ অকম্পিত প্রত্যয়ে সে বলে—

কিন্তু আমি পারি—এখনো পারি—এখনো আমি তরঙ্গিনী! ...

আমি, তরঙ্গিনী, তপস্বীকে লুণ্ঠন করেছিলাম, আর আজ কি এক তুচ্ছ জামাতাকে জয় করতে পারবো না!

উচ্চস্বরে হেসে ওঠে তরঙ্গিনী। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করি তরঙ্গিনীর জীবনের পরিণতির জন্য। অজ্ঞাতসারে চাই তার প্রেমেরই জয় হোক। কিন্তু জীবনের এই প্রত্যাশা কি শিল্প পূরণ করতে পারবে। চতুর্থ অঙ্কে আমরা তপস্বী ও তরঙ্গিনীর জীবনের আরো গভীর, আরো জটিল সমস্যার মুখোমুখি হই।

চতুর্থ অঙ্কে তপস্বীর জীবনে তরঙ্গিনীর প্রলম্বিত প্রতিক্রিয়া অন্যান্য চরিত্রের অজ্ঞাতসারে অথচ পাঠকের জ্ঞাতসারে অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে। তারপর তরঙ্গিনীর 'আগমন'। অধ্যাপক অমিয় দেবের অনুধাবনে বিষয়টি ধরা পড়েছে এইভাবে—

"চতুর্থ অঙ্কের তরঙ্গিনী এক উদ্‌ভ্রান্ত রোমান্টিক প্রেমিকা, তার অন্বিষ্ট সেই তপস্বী, যে তাকে সরলতায় দীক্ষিত করেছে। অন্যপক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গ এখন অভিজ্ঞ প্রণয়ী। প্রথম সাক্ষাতে পরস্পরের যে ভূমিকা ছিল, তা এখানে উল্টে গিয়েছে—তরঙ্গিনীই যেন খানিকটা তপস্বী, আর তপস্বী 'তরঙ্গিনী'।"

কিন্তু তপস্বী যে সম্পূর্ণতই 'তরঙ্গিনী' এমনও নয়। তরঙ্গিনী তাকে জয় করতে এসেছিল কিন্তু রাজপুরীর বিলাসে অভ্যস্ত, নাগরিক বাক্‌শিল্পী, জটিল ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে তরঙ্গিনীর যেন স্বপ্নভঙ্গ হলো—

"আমি স্বপ্নে দেখেছি সেই চোখ, জাগরণে দেখেছি সেই চোখ। আর এখন আমি তোমাকে দেখছি। ... তোমাকে? সত্যি তোমাকে? কিন্তু কোথায় তুমি? তুমি কেন হারিয়ে যাচ্ছো? তোমার চোখের সেই দৃষ্টি কি আর ফিরে আসবে না?"

তপস্বীর কাছে এই আঘাতটুকু জরুরি ছিলো। এইখান থেকেই তপস্বীর আত্ম-সন্ধানের সূচনা, এইখান থেকেই তরঙ্গিনীরও অন্যতর এক সাধনার সূত্রপাত। ঋষ্যশৃঙ্গ যথার্থই বলেন—"তরঙ্গিনী, আমার শেষ কথা তোমারই সঙ্গে। তুমি আমাকে যে উপহার দিলে আমি এখনো তার নাম জানি না। কিন্তু হয়তো তার মূল্য বুঝি। আমি তোমার কাছে চিরকাল ঋণী থাকবো। তোমাকে আমি অভিনন্দন করি।" এই ঋষ্যশৃঙ্গ তো আর তরঙ্গিনীর কাছেও ফিরে যেতে পারেন না; তরঙ্গিনীও উপলব্ধি করে এই 'পুরুষ' তার সেই স্বপ্নের তপস্বী নন। তখন সে-ও-এক অকুল অসীম শূনতায় ডুবে যায়। আকুল তার আর্তি—'প্রিয়, আমার

প্রিয়তম, আমি কি আর কোনোদিন তোমাকে দেখবো না?" ঋষ্যশৃঙ্গ বলেন—' ... তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, তরঙ্গিনী। ... আমাকে বাধা দিয়ো না, তরঙ্গিনী। তুমি তোমার পথে যাও। হয়তো জন্মান্তরে আবার দেখা হবে।' এইভাবে এক অর্থে হয়তো তরঙ্গিনীর 'অভিসার' ব্যর্থ হয়, কিন্তু আবার হয়ও না। তরঙ্গিনী একে একে ত্যাগ করে তার সব অলংকার-আভরণ; তপস্বী যেদিন যেমন করে জাগিয়েছিলেন তরঙ্গিনীকে, আজও জাগিয়ে দিলেন তাকে আর-একভাবে—তাই সামনে সকলকে রেখেও এ যেন তার স্বগতোক্তি—

আমি কী হবো তা জানি না। আমার কী হবে তা' জানি না। শুধু জানি, আমাকে যেতে হবে।

যে পথে তার যাত্রা সে পথে লোলাপাঙ্গী নেই, চন্দ্রকেতু নেই, শান্তা নেই, রাজমন্ত্রী-রাজপুরোহিত নেই, রাজা-রাজধানী নেই, সেখানে আছে এক স্বপ্নমেদুর মন্ত্রধ্বনি—"সুন্দর তোমার আনন, তোমার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল। ... আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধারে বিশ্বকরুণার বিকিরণ।'

এই কথাগুলি জপমন্ত্রের মতো আশ্রয় করেই তরঙ্গিনীর নিষ্ক্রমণ—নাট্যকারের মতে, 'পুণ্যের পথে'; হয়তো আত্ম-দর্শনরূপ সেই পুণ্যের পথে তাদের দুজনেরই যাত্রা। তপস্বী ও তরঙ্গিনী উভয় উভয়কেই জাগিয়ে দিয়ে গেলো মোহনিদ্রা থেকে, নিজেকে না চেনার অন্ধকার থেকে। এবার নিজেকে খুঁজে পাবার আকুতি থেকে তাদের যাত্রা। তরঙ্গিনী তার এই জন্মে জন্মান্তরের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে হয়ে উঠেছে এ নাটকের নায়িকা!

শান্তা

তপস্বী তরঙ্গিনীর লাস্যে প্রলুব্ধ হয়ে কৌমার্য হারিয়ে যে রাজ্যে বৃষ্টি নিয়ে এলেন, সেই অঙ্গরাজ্যের অধিপতি লোমপাদের কন্যা শান্তা। নাটকের প্রথম অঙ্কে আমরা যখন তাকে প্রথম দেখি, তখন সে রাজমন্ত্রীর পুত্র অংশুমানের প্রেমিকা, ব্যক্তিত্বময়ী, সাহসী উচ্চারণে দৃপ্ত, প্রত্যয়ী। আবার সাধারণ নারীর মতোই তার আকাঙ্ক্ষা—রাজমন্ত্রীকে সে বলেছে—

"তাত, আমি প্রকৃতি নই, আমি শান্তা—সামান্যা এক যুবতী। দেহে ও অন্তঃকরণে আমার সঙ্গে কৃষক বধুর পার্থক্য নেই। আমিও চাই পতি, সন্তান, গৃহ—চাই প্রেম-পরিণতি-বন্ধন—চাই সেবা ও স্নেহবৃত্তির স্থায়ী সার্থকতা।"

নিজের জীবন সম্বন্ধে এই বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সে ঋষ্যশৃঙ্গকে বিবাহ করতে অসম্মত এবং স্পষ্ট ভাষায় সে কথা প্রকাশও করেছে মন্ত্রীর কাছে—

'আমি স্বয়ংবরা হতে চাই'। অংশুমান যে তার প্রণয়ী একথাও জানিয়ে দেয় সে। তার আশঙ্কা—"এমন যদি হয় যে আদ্যাশক্তিকে অর্ঘ্যদান করে, তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ আমাকে ত্যাগ করলেন? যদি তাঁর মনে হয় যে ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় নারী তুচ্ছ, জায়াপুত্র নিতান্ত অলীক?" এই আশঙ্কা নাট্যশেষে বাস্তবায়িত হয়েছে এমনই দেখি। মনে হয়, নাট্যকার সুকৌশলে প্রথম অঙ্কেই নাট্য-পরিণতির বীজবপন করে রেখেছিলেন।

শান্তা অকপট সারল্যে রাজমন্ত্রীর কাছে বিবৃত করে অংশুমানের সঙ্গে তার প্রণয়-কথা, বিবাহ-অভিলাষ। আর এই অকপট উচ্চারণের জন্যই তার ভবিষ্যৎ 'নির্ধারিত' হয়ে যায় রাজমন্ত্রীর কৌশলী চক্রান্তে—

"আমি আজ রাত্রেই অংশুমানকে বন্দী করবো, কয়েকটা দিন কারাগারে কাটালে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে না। পুরস্ত্রীরা শান্তার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনকালে তাকে থাকতে হবে অনাহত ও প্রস্তুত।"

শান্তাকে আশ্বস্ত করেন তিনি কুশলী বাক্‌চাতুর্যে—"কল্যাণী, তুমি স্বদেশের কল্যাণদাত্রী হও। তোমার পতিব্রত্যের ফলাফল থেকে অঙ্গারাজ্যের শাপমোচন।' অথচ মনে মনে তিনি জানেন, "ঋষ্যশৃঙ্গকে রতিরহস্যে দীক্ষিত করবে তরঙ্গিনী; তার ফলভোগ করবে শান্তা।"

অতএব, শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ রাষ্ট্রের মঙ্গালে। শান্তাও এখানে রাষ্ট্রর হাতে 'ক্রীড়নক' মাত্র। একদিন যে সদম্ভে ঘোষণা করেছিল—'আমি অংশুমান ভিন্ন অন্য কারো অঙ্কশায়িনী হবো না।' তাকেই নাটকে আমরা দেখি, ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে বিবাহিত জীবনযাপন করে পুত্রের জননী হতে। তার উপস্থিতি আবার আমাদের সচকিত করে চতুর্থ অঙ্কে। দৃশ্যসূচনায় আমরা দেখি, রাজপ্রাসাদের একটি অলিন্দ, সংলগ্ন কক্ষের অংশ। অলিন্দে দন্ডায়মান ঋষ্যশৃঙ্গ রাজবেশে, শান্তা কক্ষে উপবিষ্ট; কেশবিন্যাসরত, তার সামনে দর্পণ, প্রসাধনী। বাইরে আকাশে পড়ন্ত বেলা।

শান্তা গুঞ্জনস্বরে গান গাইছে, ঋষ্যশৃঙ্গের স্বগত-কথন অলিন্দে; যদিও দু'জনে দু'জনের কথা কিংবা গান কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। শান্তার গানে আমরা শুনি যেন তার হৃদয়ের নিহিত হাহাকার—

সুন্দর তুমি, পেটিকা,
অন্তরে নেই রত্ন।
পাত্র এখনো মণিময়,
নিঃশেষ তার সৌরভ।
উজ্জ্বল তুমি, চক্ষু,
কেন ভুলে গেলে বার্তা?
রঙ্গিনী আজও কবরী,
অঙ্গুলি শুধু ক্লান্ত।
আসে যায় দিন-রজনী,
আসে জাগরণ, তন্দ্র
শুধু নেই হৃৎস্পন্দন

লুণ্ঠিত সব স্বপ্ন।

শান্তার গানে ব্যস্ত হয়েছে অংশুমান-হীন তার লুণ্ঠিত স্বপ্ন জীবনের রিক্ততা। রাষ্ট্রের কাছে দায়বদ্ধতায়, পরিবারের কাছে, সমাজের কাছে, দায়বদ্ধতায় শান্তার জীবনের সহজ সুখটুকু হারিয়ে গেছে—আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের ভার কেড়ে নিয়েছে তার কৃষক-বধুসুলভ 'সুখী' জীবনের স্বপ্ন। বাহ্যিক বৈভবের আবরণে আবৃত হয়ে গেছে তার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে অভ্যস্ত জীবনের ফাঁকিটুকু এরপর আর আমাদের অগোচরে থাকে না। কিন্তু 'স্বামী'র কাছে তাকে গোপন রাখতে হয় এই দ্বিচারিতা। তাই ঋষ্যশৃঙ্গকে বলতে হয়, 'আপনার গৌরবে গর্বিত আমি, প্রভু।' ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে তার কথোপকথনে কান পাতলেই ধরা পড়ে 'জিহ্বা মসৃণ, শব্দকোষ বিশাল' 'কর্তব্য অফুরান' কিন্তু 'বক্তব্য স্বভাবতই বিরল'। বস্তুত, এ তো আধুনিক মানুষের সংকট, সংযোগের সমস্যা। পৌরাণিক চরিত্র তো স্বভাবতই আদর্শায়িত, নীতিপুষ্ট, আলঙ্কারিক। এই হৃৎস্পন্দন-হীন নিঃশেষিত সৌরভ লুণ্ঠিত-স্বপ্ন জীবনে শান্তা স্বভাবতই অ-সুখী, ক্লান্ত; ঋষ্যশৃঙ্গেরও দিন বিবর্ণ, জীবন বিস্বাদ। তবু তো 'আসে যায় দিন-রজনী' 'আসে জাগরণ, তন্দ্রা', গভীর নিষ্ঠায় প্রাত্যহিকতার 'পালন'! আর হঠাৎই প্রিয় পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে উৎকর্ণ শান্তার আকস্মিক প্রতিক্রিয়া—"এ যে সেই! আমি কোথায় লুকোবো? কোথায় পালাবো? কোথায় গেলে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না?"

অংশুমানের উপস্থিতিতে শেষপর্যন্ত শান্তার সব প্রতিরোধ ভেঙে যায়। শান্তা প্রথমে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে—'অংশুমান, আমি এখন পরস্ত্রী! আমি পুত্রবতী—মাতা!' এমনকী একসময় 'স্বামী'-কেই বর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে সে—"আমি পরিণীতা! স্বামী, আপনি কেন নীরব? আমাকে রক্ষা করুন। ... আমি অসহায়—আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।" কিন্তু 'সত্য ছাড়া যে আর আশ্রয় নেই, তাই হয়তো কোন অসতর্ক মুহূর্তেই উচ্চারিত হয় সেই 'সত্য'—

'অংশুমান—আমাকে দয়া করো, আমাকে ক্ষমা করো। আমার জীবন নষ্ট হয়েছে হোক, কিন্তু তুমি যেন শান্তি পাও এখনো আমার দিবানিশি এই প্রার্থনা।'

তারপর হঠাৎ সে কী বললো তা উপলব্ধি করে—'স্বামী, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আত্মহারা হয়েছি—কী বলেছি তা জানি না।

ঋষ্যশৃঙ্গও এই 'শুভ' লগ্নে ভারমুক্ত হতে চেয়েছেন—'আমারও একটি গোপন কথা তোমাকে বলি।' কেননা শান্তা তো কোনো 'অপরাধ' করেনি, 'সত্য' বলেছে মাত্র।

নাটকে শান্তা অংশুমানের প্রেমিকা, ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী, আবার অংশুমানের 'ভার্যা'। এই শেষতম পরিচয়ের আভাস আছে, বিস্তার নেই। জায়া বা জননী হিসেবে তার গর্ব বা সুখ অনেকটাই আনুষ্ঠানিক, তাই অংশুমানের দাবি-প্রতিষ্ঠার মুহূর্তে সামাজিক লোকাপবাদের ভয়ই বড় হয়ে উঠেছে। তরঙ্গিনী আসার পর কিংবা লোলাপাঙ্গীর কাতরতায় বারবার সে 'স্বামী'কে 'সহধর্মিনী' হিসেবে কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ অবিচল, আর কোনো 'ছলনা' তাঁকে আত্মবিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দেবে না। তাই ঋষ্যশৃঙ্গের নিষ্ক্রমণ,—যাবার আগে তিনি শান্তাকে ফিরিয়ে দেন তার কৌমার্য, 'শান্তা ও অংশুমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে বিনতি' করে। প্রশ্ন

স্বভাবতই জাগে, শান্তা চরিত্র কি একেবারেই নির্দ্বন্দ্ব এখানে? অংশুমানকে ফিরে পাওয়া তার নতুন জীবন অবশ্য নাটকের 'বিষয়' নয়। বস্তুত, শান্তা চরিত্রটি তার প্রেমে, দ্বিচারিতায়, অসহাতায়, সারল্যে বেদনায় জীবন্ত, বিস্মৃত জায়গা সে হয়তো পায়নি, কিন্তু তা' বলে সে উপেক্ষিতও নয়।

৬.৭ অন্যান্য চরিত্র

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকে গৌণ চরিত্রসমূহও প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে। তরঙ্গিনীর জননী লোলাপাঙ্গী, প্রণয়প্রার্থী চন্দ্রকেতু, শান্তার প্রণয়ী মন্ত্রীপুত্র অংশুমান, রাজমন্ত্রী, রাজপুরোহিত প্রতিটি চরিত্রই নাটকের পরিণতিদানে তৎপর। লোপাপাঙ্গী নগর-গণিকাপ্রধানা, কলানিপুণ, বাক্‌পটীয়সী এবং অর্থ-লিপ্সু। তাই কন্যাকে মূলধন করেও সে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য অর্থ-উপার্জন করে নিতে চায়। ঋষ্যশৃঙ্গ-মিলনে বিবশ বিহ্বল তরঙ্গিনীকে সে বারবার ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে তার পুরাতন অভ্যস্ত জীবনাচরণে, কেননা 'বারাঙ্গনারা স্মৃতি নিয়ে বিলাস করে না'। কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব-জটিলতা ছাড়াই সে মাতা এবং দূতীর যুগ্ম ভূমিকা পালন করেছে। চন্দ্রকেতুর দেওয়া আঙটি পরে কন্যার কাছে উপস্থিত হয়েছে, কেননা 'স্বকর্মে যাদের নিষ্ঠা আছে' তাদের কাছে পারিবারিক বা সামাজিক কোনো সম্পর্কই গ্রাহ্য নয়, একথা লোলাপাঙ্গী জানে এবং মানে। হয়তো গভীরতার অভাব থেকেই সে বিশ্বাস করে তপস্বীর কৌমার্য ভঙ্গের অপরাধেই তরঙ্গিনী শাপগ্রস্ত, অন্যমনা এবং সেজন্যই চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে উপস্থিত হয়। নিজের কন্যার মানস-সংকটের সমস্যাটি লোলাপাঙ্গীর কাছে স্পষ্ট হতে পারেনি। নাটকের শেষে লোলাপাঙ্গী এবং চন্দ্রকেতুর পরস্পর নির্ভরতা, লোলাপাঙ্গীর গৃহেই চন্দ্রকেতুর আবাহন নারী-পুরুষ সম্পর্কের এক জটিলতার ইঙ্গিত। এ ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসুর অবলোকনটি প্রণিধানযোগ্য ঃ "... তাদের দুঃখটা মেকি নয়, কিন্তু তাদের পক্ষে জীবনের গ্রাস অপ্রতিরোধ্য। কিছুটা চেতন, কিছুটা অচেতনভাবে আত্মপ্রতারণা করছে তারা, কেননা তরঙ্গিনীকে হারাবার পরেও তাদের বেঁচে থাকতে হবে। তারা ঘৃণা অথবা উপহাসের পাত্র নয়, বরং ঈষৎ করুণ; যেহেতু তারা সাধারণ এবং পরাজিত, তাই আমাদের অনুকম্পা তাদের প্রাপ্য।"

তরঙ্গিনীর জননী রূপাজীবী লোলাপাঙ্গীর পাশাপাশি আমরা লক্ষ করি ঋষ্যশৃঙ্গ-পিতা বিভাণ্ডক মুনিকে। পুত্রকে তিনি শিখিয়েছেন, 'আমরা ব্রহ্মচারী। কঠিন আমাদের নিষ্ঠা, দুর্জয় আমাদের নিয়ম।' কিন্তু 'নারী' কি এ শিক্ষা তিনি পুত্রকে দেননি, এবং সেই অনভিজ্ঞতাই ঋষ্যশৃঙ্গকে 'অভিজ্ঞ' করে তুললো। নাট্যকার বিভাণ্ডক চরিত্রে দুটি দিকে আলোকপাত করতে চেয়েছেন—একটি তাঁর পুত্রস্নেহ, অন্যটি পুণ্যলোভ। মহাভারতীয় চরিত্র কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছে এখানে। মহাভারতে দেখি, বিভাণ্ডক লোমপাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হলেও পরে রাজধানীতে এসে পুত্রের বৈভব দেখে তুষ্ট হন এবং বলেন, 'পুত্র, তোমার পুত্র, উৎপন্ন হইলে ভূপতির প্রিয় কার্য সকল সর্বপ্রযত্নে সম্পাদন করিয়া কাননে গমন করিবে।' 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকেও দেখি পুত্রের প্রতি তার ক্ষোভ প্রকাশ পেলেও তিনি পুত্রার্থে কাতর—বারবার অনুরোধ করেছেন ঋষ্যশৃঙ্গকে ফিরে পাবার জন্য। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁকে ফিরিয়ে দেন শূন্যহাতে। ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার লোভের ইঙ্গিত দিলে

বিভাণ্ডক বলেন, শুধু 'পঞ্চদশ গ্রামের জন্য নয়, সে সময়ে অঙ্গদেশের দুর্দশা দেখে আমি দয়া পরবশ হয়েছিলাম। তাই তোমাকে বলপূর্বক প্রত্যাহরণ করিনি। নাট্যউপান্তে পুত্রের কাছে পিতার বিদায়গ্রহণ মর্মস্পর্শী।

রাজমন্ত্রীর পুত্র অংশুমান রাজকন্যা শান্তার প্রণয়মুগ্ধ। উভয়ের প্রেম সেদিন সার্থকতা পেলো না। কেননা রাজ্যের দুর্দিন। ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার বিবাহ সাধিত হল রাষ্ট্রিক কল্যাণে, সেদিন অংশুমান রইলো কারাগারে বন্দি হয়ে। কারামুক্ত অংশুমানের কাছে শত্রু একজন—ঋষ্যশৃঙ্গ। তরঙ্গিনীর প্রণয়প্রার্থী চন্দ্রকেতুর কাছেও শত্রু একজন—ঋষ্যশৃঙ্গ। এই দুটি পুরুষ চরিত্রই অনেকাংশে সাধারণ। অংশুমান তপস্বীকে অভিযুক্ত করেছে, ভর্ৎসনা করেছে; তারপর শান্তাকে ফিরে পেয়ে ঋষিকে প্রণাম জানিয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার কুমারীত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, অংশুমান তাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। তপস্বিনী তরঙ্গিনীকে অজানার পথে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখে চন্দ্রকেতু অনায়াসে লোলাপাঙ্গীর অনুগমন করেছে। অংশুমান প্রণয়িনীকে ফিরে পেয়ে প্রশ্নহীন, চন্দ্রকেতু প্রণয়িনীকে হারিয়েও প্রশ্নহীন। অথবা এ তাদের অসহায়তা। রাজমন্ত্রীর কূটনীতি, চাতুর্য, রাজ-আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা নাটকে স্পষ্ট—বৃহত্তর স্বার্থে নিজের পুত্রের প্রতিও তিনি নির্মম। আবার ঋষ্যশৃঙ্গের বরে কৌমার্য ফিরে পাওয়া শান্তাকে অংশুমানের সঙ্গে বিবাহের আয়োজনেও তিনি তৎপর। রাজমন্ত্রী এই বিবাহে যেটুকু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তা' অবসিত হয় রাজপুরোহিতের কালদর্শী প্রাজ্ঞ উচ্চারণে—

তোমরা অবতীর্ণ মঞ্চে—প্রার্থী, মাতা, অমাত্য;
কেউ কামার্ত, কেউ সহৃদয়, কেউ রাষ্ট্রপাল;
চক্রনেমির মুহূর্ত-বিন্দুতে ঘূর্ণিত হবে তোমরা
বহু মঞ্চে, বহু ভূমিকায়, যতদিন আয়ু না হয় নিঃশেষে, ...

৬.৮ অনুশীলনী

- 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-তে বুদ্ধদেব বসুর লেখনীতে পুরাণের পুনর্জন্ম কীভাবে সাধিত হয়েছে? আলোচনা করুন।
- ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রে আধুনিক যুগের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনার স্বরূপটি পরিস্ফুট করুন।
- 'পতিতা' তরঙ্গিনী নাট্যশেষে 'তপস্বিনী' তরঙ্গিনীতে রূপান্তরিত—আলোচনা করুন।
- 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কাব্যনাটক হিসেবে কতটা সার্থকতা লাভ করেছে দেখান। নাটকটির নামকরণ সার্থকতা বিচার করুন।
- শান্তা চরিত্রের দ্বৈধতা স্বল্প পরিসরেই তাঁকে রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র করে তুলেছে—আলোচনা করুন।

- 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকে গৌণ চরিত্রগুলির ভূমিকা বিচার করুন।
- রবীন্দ্রনাথের পতিতা এবং বুদ্ধদেব বসুর তরঙ্গিনীর তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

- তপস্বী ও তরঙ্গিনী—বুদ্ধদেব বসু, আনন্দ পাবলিশার্স
- আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য—উদ্ভব ও বিকাশ—কণিক সাহা, সাহিত্যলোক
- বুদ্ধদেব বসু ঃ মননে অন্বেষণে—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি
- বুদ্ধদেব বসু ঃ নানা প্রসঙ্গ—সম্পাদনা—আনন্দ রায়, বর্ণালী
- তপস্বী ও তরঙ্গিনী ঃ কয়েকটি প্রসঙ্গ—লায়েক আলি খান, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।

বাংলা (ষষ্ঠ পত্র)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায় ঃ ৩